ধারাবাহিক উপন্যাস • কমিক্স • অন্যান্য নিয়মিত বিভাগ
আনন্দমেলা
৫ অগস্ট ২০২৩
ফরেন্সিকের গোয়েন্দারা
খুনের তদন্ত কী ভাবে করেন আসল গোয়েন্দারা? কোন ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে অপরাধী?
নানা স্বাদের ৫টি গল্প
বেড়ানো
ব্রাসেলস ভ্রমণ
খেলাধুলো
যশপ্রীত বুমরার প্রত্যাবর্তন
নতুন তারকা আলকারাজ়

৪৯ বর্ষ ৭ সংখ্যা ৫ অগস্ট ২০২৩ ১৯ শ্রাবণ ১৪৩০

আনন্দমেলা

সূচিপত্র

প্রচ্ছদ কাহিনি

ফরেন্সিকের গোয়েন্দারা ৮

গল্পের বইয়ে পড়া গোয়েন্দা আর সত্যিই যাঁরা রহস্যমৃত্যুর কিনারা করেন, তাঁরা কতটা আলাদা? লিখেছেন ইন্দ্রনীল সান্যাল
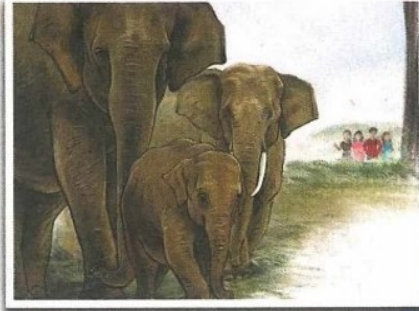
প্রচ্ছদ: প্রসেনজিৎ নাথ

সম্পাদক: সিজার বাগচী

দাম: কুড়ি টাকা

এবিপি প্রাঃ লিমিটেডের পক্ষে প্রদীপ্ত বিশ্বাস কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাঃ লিমিটেড সি পি-৪, সেক্টর ফাইভ, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৯১ থেকে মুদ্রিত। বিমান মাশুল: আন্দামান, মণিপুর, অসম আর ত্রিপুরার এক টাকা। পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার অনুমোদিত। এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ও বিষয়বস্তু সম্পর্কিত কোনও দায় পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়।

Rs: 20.00

Edited by Caesar Bagchi and printed and published fortnightly by Pradipta Biswas on behalf of ABP Pvt. Ltd. 6, Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700001. Printed at Ananda offset Pvt. Ltd., CP-4, Sector V Salt Lake City, Kolkata-700091

Export of this magazine to U.S.A is through our authorised agent only.

Year 49, Issue 7
RNI Regd No. 27057/75

আনন্দমেলা এ বার ওয়েবসাইটে: www.anandamela.in

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা

চিরকালের রত্ন

সিগনেটের বই

চটজলদী কবিতা ১৫০.০০

চট্‌জলদীর কত কাজ! "যেতে হয় হাট করতে শেয়ালদয়, একটি পকেট-কম্পাশ্‌ না হলেই নয়—কোন্‌ দিকে যাই চিনে উত্তরে না দক্ষিণে পূবে না পশ্চিমে— ভারি গোলে পড়ি;" এহেন চট্‌জলদীর গল্পে ভরা 'চট্‌জলদী কবিতা'। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিস্ময়কর সৃষ্টি। অনাবিল মজায় ভরপুর।

বাদশাহী গল্প ১৫০.০০

বাদশাবাবু গল্প শোনে। দাদামশায় গল্প বলে। দাদামশায়টা কে? ভূতখানার কিউরেটর ও তার সঙ্গীর সংলাপ— "আমরা কিন্তু ধরেচি ঠিক আপনি অবুনিবাবু না হয়ে যান না। শিল্পীপ্রাণ শিল্পীপ্রোদান শিল্পাচার্য্য..."। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অমর সৃষ্টি 'বাদশাহী গল্প'। অদ্ভুতুড়ে রস। হাসিখুশির অবাক জলপান।

রাজ কাহিনী ২৫০.০০

সত্যজিৎ রায় চিত্রিত

রাজ কাহিনীতে অবনীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন কথার ছবি দিয়ে গল্প শোনাতে। রূপকথার আদলে এই অপরূপ কথা সত্যজিৎ রায়ের অলঙ্করণে এক দুর্লভ সংগ্রহ।

আপন কথা
২০০.০০

একশো বছর আগের সেই দুর্লভ বাল্যস্মৃতি, দেখার পুঁজি আর জানার সম্বল, রূপকথার মোড়কে পুরে যেন উপহার দিয়েছেন অবনীন্দ্রনাথ।

খাতাঞ্চির খাতা ১০০.০০

মনিবের খাতাঞ্চিমশায় খাতা জুড়ে কেবলই লিখে চলেছেন জমা আর খরচ। সেই খাতাঞ্চির খাতার সূত্র ধরেই এক দারুণ মজাদার কাহিনি এই বইতে।

নালক ৫৫.০০

ধ্যানমগ্ন ছোট্ট ছেলে নালকের চোখের সামনে ফুটে-ওঠা বুদ্ধের সারা জীবনের ছবি। জানতে গেলে পড়তে হবে এ বই।

ক্ষীরের পুতুল ৮০.০০

এক রাজা, তার দুয়োরানি আর সুয়োরানি এবং জাদুকরের দেশের এক মায়া-বানর— এই ক'টি মূল চরিত্র নিয়েই এক অবাক-করা রূপকথা।

বুড়ো আংলা
১০০.০০

গণেশ ঠাকুরের শাপে বিচ্ছু ছেলে রিদয় হয়ে গেল বুড়ো আঙুলের মাপে এক যক। কী করবে এখন রিদয়? এ বইয়ের পাতায় পাতায় ছবি।

ভূতপত্রীর দেশ ৩০০.০০

দেশ তো নয় খেইহারানো খেয়ালখুশির এক আশ্চর্য জগৎ।

রাজকাহিনী ১২৫.০০

'রাজকাহিনী'তে রাজস্থানের ইতিবৃত্ত শোনাতে চাননি অবনীন্দ্রনাথ, চেয়েছেন গল্প শোনাতে। ইতিহাসের অপরূপ কথা 'রাজকাহিনী'।

শকুন্তলা ৬০.০০

কালিদাসের অমর নাটকের বেদনামধুর অসামান্য কাহিনিকেই ছোটদের জন্য নতুন করে লিখেছেন।

হাওয়াবদল ও অন্যান্য রচনা ১২৫.০০

দিনলিপির ধরনে অনন্য শব্দচিত্রাবলীর সংগ্রহ এই বই। নানা টুকরো রচনার অসামান্য সংকলন।

আনন্দ পাবলিশার্স এবং ব্রেনওয়্যারের যৌথ উদ্যোগে

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ক্ষীরের পুতুল ২৫০.০০

চিরকালের ক্লাসিক এবার রঙিন অ্যানিমেশন ফিল্মে। রঙিন বই এবং আকর্ষণীয় ভিসিডি বিশেষ গিফ্‌ট প্যাকে।

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন • কলকাতা ৭০০ ০০৯ ফোন ২২৪১-৪৩৫২, ২২৪১-৩৪১৭
ই-মেল publishers@anandapub.in • ওয়েবসাইট www.anandapub.in

নিত্যনতুন বইয়ের খবর পেতে আজই লগ ইন করুন।

দস্যি ডেনিস
সব শুনছি, হিহি

মনে হচ্ছে, আমাদের ছোট্ট দস্যিটা ঘুমিয়ে পড়েছে।
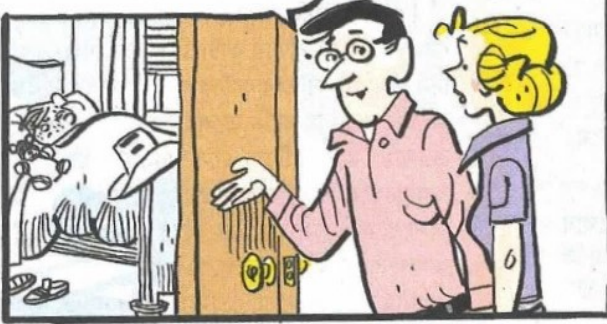
ডেনিস, তুমি দাঁত মেজেছ আজ?

প্রার্থনা করেছ?

হাত ধুয়েছ?

আমার মনে হয়, ও ঘুমোনোর ভান করছে।

মোটেও না।

সাঁতার কাটতে তোমরা অনেকেই ভালবাসো। এক বার কি কখনও জলের তলায় চোখ খুলে দেখেছ? যদি দেখে থাকো, কেমন সে দুনিয়া? লেখা প্রতিযোগিতার ফলাফল।

প্রথম

গরমের ছুটিতে মামাবাড়ি গিয়েছিলাম দিন কয়েক। মনটা খুব খারাপ হয়, বিকেল হলেই সাঁতার ক্লাসের কথা ভেবে। এ সব শুনে তুতুলমামা বলে আমাদের, "তালদিঘিতে সাঁতার কাটবি?" সেই মতো পর দিন দুপুরেই চলে এসেছি পাড়ে, তর তর করে জলে নেমেছি। প্রথমেই ডুব সাঁতার... কিন্তু এ কী! কোথায় চলেছি... আস্তে আস্তে জলের রং পাল্টে যাচ্ছে আর আমি যেন আরও গভীরে চলে যাচ্ছি। সামনে দেখি মৎস্যকন্যা, পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। জলের আরও গভীরে পৌঁছে দেখতে পেলাম অক্টোপাস, শঙ্খ, প্রবাল, কত ধরনের শ্যাওলা। কিন্তু দূরে ওটা কী? দেখি এক তিমি! কিন্তু মনে হল যেন কাঁদছে। দেখলাম মুখ নাড়তে পারছে না, প্লাস্টিকে ভর্তি। সে বলল, "তোমাদের জন্য আজ মরতে বসেছি আমরা সবাই, আমাদের মেরে তোমরা মানুষরাও বাঁচবে না।" এমন সময় এক অক্টোপাসের শুঁড় প্রায় পেঁচিয়ে ফেলেছিল আমাকে, পাশ কাটিয়ে যেই ঘুরেছি, দেখি এক হলদে কাঁকড়া বড় বড় দাঁড়া নিয়ে গলাটায় চেপে বসেছে। আমি ছাড়ানোর জন্য চিৎকার করে উঠেছি, দেখি মামা বলে, "আরে ছাড়, ছাড়, জলে নামবি না?" 'কী হল?' ভাবছি ব্যাপারটা, দেখি এক বড় কাঁকড়া আমার দিকে তাকিয়ে জলে নেমে গেল, তার রংটাও হলুদ!

কাঁকড়া

সমগ্না ঘোষ
দ্বিতীয় শ্রেণি, মাউন্ট লিটেরা জি স্কুল, পশ্চিম মেদিনীপুর।

দ্বিতীয়

গত বছর পুজোর ছুটিতে গ্রামের বাড়ি গেছিলাম। সেখানে বাড়ির সামনেই একটা পুকুর। তাই মেজদা আমায় সাঁতার কাটাও শিখিয়ে দিল। এক দিন কিছু ক্ষণ সাঁতার কাটার পর, আমার পা কিছুতে জড়িয়ে যাওয়ায় আমি জলের গভীরে নামতে শুরু করলাম। যখন মাটিতে এসে আমার পা ঠেকল, তখন অবাক হয়ে দেখলাম আমার চার পাশ দিয়ে ছোট-বড় অসংখ্য রঙিন মাছ যাওয়া-আসা করছে। তখন একটা কচ্ছপ এসে আমায় বলল, "জলের নীচের পৃথিবীতে তোমায় স্বাগত। চলো, তোমায় এই দুনিয়াটা ঘুরিয়ে দেখাই।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি কে?" "তোমার বন্ধু," এই বলে কচ্ছপটা এগোতে শুরু করল। তার পর আমায় কত ধরনের মাছ দেখাল! তাদের সম্বন্ধে কত কী বলল। এ রকম অপূর্ব দুনিয়া আমি স্বপ্নেও কল্পনা করিনি। অনেক ক্ষণ ঘোরার পর, সে বলল, "এই রে, সন্ধে হয়ে আসছে। তোমার মা-বাবা নিশ্চয়ই চিন্তা করছেন।" আমি বললাম, "হ্যাঁ, এ বার আমায় যেতে হবে।" কচ্ছপটা বলল, "চলো, তোমায় ছেড়ে দিয়ে আসি।" পাড় পর্যন্ত এসে সে বলল, "বন্ধু, আবার এসো কিন্তু!" "আবার আসব," বলে চলে এলাম। ভাগ্যিস সাঁতারটা শিখেছিলাম, তবেই তো জলের তলার দুনিয়াটা দেখতে পেলাম!

অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়
সপ্তম শ্রেণি, শিলিগুড়ি উচ্চ বালক বিদ্যালয়।

কচ্ছপ

তৃতীয়

ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব অনুযায়ী জলের তলায় প্রথম প্রাণের উদ্ভব ঘটেছিল। যখন ছোট ছিলাম, মা ও দিদার মুখে শুনেছিলাম চালসায়, মায়ের দিদার বাড়ির অনতিদূরে অপরূপ রূপ নিয়ে বয়ে চলে পাহাড়ি নদী কুর্তি, যার জলের নীচে পাথরের খাঁজে-খাঁজে লুকিয়ে থাকত হরেক রকম মাছ। নদীর তলায় নুড়ি পাথরের প্রাচুর্যও ছিল লক্ষণীয়। এর পর আমি যখন চালসায় গেলাম, তখন কৌতূহল দমন করতে না-পেরে ছুটলাম সেই বহুচর্চিত নদীর কাছে। নুড়িখচিত নদীর তলায় দেখলাম, ছোট-মাঝারি চঞ্চল মাছেদের দুরন্ত হুল্লোড়। আমি এমন দৃশ্য আশা করিনি। মনে হয়েছিল নগরায়ন ও বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে হয়তো কুর্তি নদীর স্বচ্ছ জল নর্দমার জলের মতো হয়ে গিয়েছে, তবে পুরো ব্যাপারটাকে বিশ্লেষণ করার পর আমার অবাক হওয়াটা অযৌক্তিক মনে হল। আসলে শহর ও জনস্রোত থেকে একটা দূরত্ব বজায় রাখতে পেরেই কুর্তির প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মানের এখনও অধঃপতন হয়নি।
আমরা বিজ্ঞানের অগ্রগতি করতে গিয়ে প্রকৃতিকে দিন-দিন মেরে ফেলছি। আশা এই যে, বিজ্ঞান চলুক বিজ্ঞানের মতো আর প্রকৃতিকে বেঁচে থাকতে দেওয়া হোক তার নিজের মতো।

মুগ্ধ আদিত্য
অষ্টম শ্রেণি, অমরপতি লায়ন্স সিটিজেন্স পাবলিক স্কুল, শিলিগুড়ি।

জলের তলায় মাছের মেলা

চতুর্থ

সুবর্ণরেখা নদীর তীরে পিকনিকে গিয়েছি। জলে পা ডুবিয়ে বসে খুব মজা! স্বচ্ছ জলে ছোট ছোট মাছের ঝাঁক। তাদের খেলা দেখতে দেখতে কখন আনমনা হয়ে গেছি। আচমকা এক প্রকাণ্ড ঢেউ এসে আমাকে জলের নীচে টেনে নিয়ে গেল! জলের নীচে সাঁতার কাটতে কাটতে এক বিরাট সোনার দরজার সামনে এসে হাজির হলাম। নানান রত্নখচিত দরজা। জমকালো সৌন্দর্যে চার দিক ঝলমলে। চার পাশ নানা রঙের লতাপাতা, রংবেরঙের ফুলের শোভায় অপরূপ। কৌতূহলী মন, দরজা খোলার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কিছুতেই খোলে না! হঠাৎ দরজা খুলে গেল! কে? চোখ তুলতেই আশ্চর্য হয়ে গেলাম! সামনে অপরূপ এক জলপরি। আমায় স্বাগত জানাচ্ছে। তার পর যেই আমি ভিতরে পা রাখলাম, আমিও জলপরি হয়ে গেলাম। অনেক ক্ষণ জলপরির দেশে আনন্দে কাটানোর পর মায়ের কথা মনে পড়তেই দরজার দিকে ছুটে গেলাম। দরজা খুলতেই আমি জালে বন্দি। চোখ কচলে ভাল করে তাকিয়ে দেখি, মা! মশারি তুলে বলল, "উঠে পড়, স্কুলে যাবি না?" কল্পনা আর বাস্তব মিশে এলোমেলো!
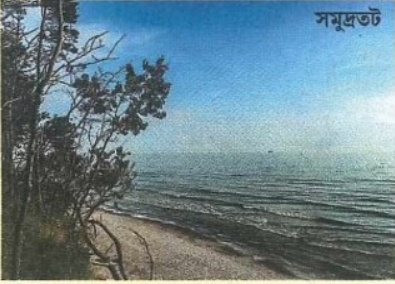
অনুরূপা ভুঁইয়া
চতুর্থ শ্রেণি, ক্রাইস্ট চার্চ
গার্লস হাই স্কুল, দমদম,
কলকাতা।

সমুদ্রতট

আরও যারা ভাল লিখেছে

অদিতি বিশ্বাস
চতুর্থ শ্রেণি, সবুজ অবুঝ শিশু অঙ্গন,
হায়দরপুর,মালদহ।

উষ্মিক পাত্র
ষষ্ঠ শ্রেণি, কাঁথি মডেল ইনস্টিটিউশন,
কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর।

অজয্য ভট্টাচার্য
ষষ্ঠ শ্রেণি, আলিপুরদুয়ার হাই স্কুল (বয়েজ)।

অন্বিজা চিকি
তৃতীয় শ্রেণি, সেন্ট জন্‌স ডায়োসেশন
গার্লস হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, কলকাতা।

সম্প্রীতি ঘোষ
সপ্তম শ্রেণি, খানাকুল কৃষ্ণভামিনী
বালিকা বিদ্যালয়, হুগলি।

চিত্রলেখা দাশ
অষ্টম শ্রেণি, সাঁকরাইল গার্লস হাই স্কুল, হাওড়া।

অরণি দে
অষ্টম শ্রেণি, ডন বস্কো স্কুল ব্যান্ডেল, হুগলি।

রঙিন মাছেরা

সাঁতার কাটতে আমি খুবই পছন্দ করি। আমি মাঝে-মধ্যেই পুকুরে স্নান করি। এক দিন আমি স্নান করছি, তখন পুকুরে ডুবে এক অপরূপ দৃশ্য দেখলাম। যেন আমি অন্য জগতে এসেছি। পুকুরের তলায় ডুব দিলাম তো এই সমুদ্রের মতো দৃশ্য দেখছি কেন? এত রঙিন মাছ! একটু নীচে যেতে দেখলাম টাইটানিক জাহাজ। মনে মনে ভাবলাম পুকুরে টাইটানিক! কিন্তু যাই হোক, টাইটানিক দেখতে পাচ্ছি, এটাই অনেক। কী সুন্দর ও কত বড় এই জাহাজ। দেখতে বেশ ভাল লাগছে। শ্যাওলায় ঢাকা বড় জাহাজ। কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল করলাম, আমিই বা এত ক্ষণ নিঃশ্বাস আটকে আছি কী করে? আমি তো মানুষ, জলজ প্রাণী না। হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল এবং আমি খাট থেকে পড়ে গেলামও। ভাবলাম পুকুরে সমুদ্রের মতো রঙিন মাছ, সি-হর্স ও টাইটানিক এই সব স্বপ্ন দেখছিলাম। যাই হোক স্বপ্ন হোক বা সত্যি, পুকুরে সাঁতার কাটতে ডুব দিয়ে চোখ খুলে নীচের যে দুনিয়া দেখি, তার চেয়ে সমুদ্রের নীচের দুনিয়া একটু আলাদা। আমাদের দুনিয়ার চেয়ে ওই দুনিয়ার নীচের সৌন্দর্য অনেক বেশি সুন্দর এবং স্বপ্নটা বেশ ভালই দেখলাম।

রঙ্গন সাধুখাঁ
ষষ্ঠ শ্রেণি, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ
মিশন, ব্যারাকপুর।

এ বারের প্রতিযোগিতা

সামনেই আসছে শিক্ষক দিবস। তোমার প্রিয় শিক্ষক কে এবং কেন? যারা ক্লাস টু থেকে এইটে পড়ো, আনন্দমেলার দফতরে লেখা পাঠাবে ২৫ অগস্টের মধ্যে। বাড়ির ঠিকানা, পিনকোড, ফোন নম্বর, স্কুলের নাম, ক্লাস, ঠিকানা, ফোন নম্বর জানিয়ো বাংলা আর ইংরেজিতে। লেখার শব্দসংখ্যা ১৫০। মনে রেখো। সেরা কয়েকটি লেখা আমরা ৫ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় ছাপব। anandamelamagazine@gmail.com এই ইমেল আইডি-তেই লেখা পাঠাবে, মেলবডিতে পেস্ট করে। ফটো তুলে পাঠাবে না।

ফরেন্সিকের গোয়েন্দারা

খুনের তদন্ত কোন পথে এগোয়? গোয়েন্দার বুদ্ধির সঙ্গে কী ভাবে হাত ধরাধরি করে রহস্য সমাধান করে বিজ্ঞান? লিখেছেন **ইন্দ্রনীল সান্যাল**

বালিগঞ্জে জোড়া খুন

বালিগঞ্জের বাগান-ঘেরা প্রাসাদোপম বাড়ি মল্লিক ভবনে খুন হয়েছেন ষাটোর্ধ্ব সুশান্ত মল্লিক। অর্থবান এবং শৌখিন মানুষটির স্ত্রী মারা গেছেন পাঁচ বছর আগে। ছেলে অয়ন ও পুত্রবধূ প্রাপ্তি বাবার সঙ্গে মল্লিক ভবনেই থাকে। ওরা দু'জন রোজ সন্ধেবেলা রেনেসাঁস ক্লাবে যায়। সারা ক্ষণের কাজের লোক পল্টু খুবই বিশ্বস্ত, তবে গোটা পাড়ার লোক জানে, সন্ধে হলেই সে ঘুমিয়ে পড়ে। ৫ অগস্ট রাতে অয়ন আর প্রাপ্তি ক্লাব থেকে বাড়ি ফিরে দেখে যে, সুশান্ত সিলিংয়ের হুক থেকে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছেন। ঘরে ধস্তাধস্তির চিহ্ন। পল্টুও নিজের ঘরে মরে কাঠ হয়ে পড়ে আছে। অয়ন তাড়াতাড়ি পুলিশে খবর দেয়। স্থানীয় থানার পুলিশ আধিকারিক বরুণ সরকার এলেন, সরেজমিনে তদন্ত করলেন, ময়নাতদন্তের জন্যে মৃতদেহ পাঠিয়ে দিলেন মেডিকেল কলেজের ফরেন্সিক বিভাগে। অয়ন আর প্রাপ্তিকে জেরা করলেন, সিসিটিভি ফুটেজ দেখলেন। একই সঙ্গে অয়ন ডেকে

পাঠাল এক প্রাইভেট ডিটেকটিভকে...

দাঁড়াও দাঁড়াও! আনন্দমেলার পাঠকদের বলছি। এটা কোনও ডিটেকটিভ স্টোরি নয়! এটা কভার স্টোরি। যেখানে তোমরা জানবে, বাস্তবের গোয়েন্দারা কী ভাবে কাজ করেন। এবং সত্যি কথাটা জেনে বেজায় দুঃখ পাবে। গল্পের গোয়েন্দারা দুষ্প্রাপ্য পুঁথি, বিরল চিঠি বা ভীষণ দামি মূর্তি চুরির তদন্ত করতে পারেন। কিন্তু খুনের ক্ষেত্রে সরকারি আধিকারিক ছাড়া অন্য কারও তদন্তের অধিকার নেই। এঁরা হলেন পুলিশ, ময়নাতদন্তের চিকিৎসক, আগ্নেয়াস্ত্র বিশেষজ্ঞ এবং বিষবৈদ্য।

আমি সরকারি চিকিৎসক, আমার কাজের ক্ষেত্র প্যাথোলজি। তবে সরকারি আদেশনামার কারণে নিয়মিত ময়নাতদন্ত করতে হয়, পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হয়, কোর্টে গিয়ে 'এক্সপার্ট উইটনেস' বা 'বিশেষজ্ঞ সাক্ষী' হিসেবে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়। সেই সব অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেব বলেই মল্লিক ভবনে জোড়া খুনের কাল্পনিক কাহিনি দিয়ে শুরু করলাম।
একটা কথা মাথায় রাখো। কাল্পনিক হলেও এই কাহিনিতে যে সব পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে, বাস্তবে সেগুলো ঘটে। তোমরা জানতে পারো না। তোমরা জানতে পারো যে, একটা খুন হয়েছে এবং পুলিশ তদন্ত করছে। খুনি ধরা পড়েছে এবং আদালতে খুনির শাস্তি ঘোষণা হয়েছে। অপরাধ ও শাস্তির মধ্যিখানে যা যা ঘটে, সেটাই এই প্রচ্ছদকাহিনির বিষয়।

বাস্তবের গোয়েন্দারা

আগেই বলেছি, অস্বাভাবিক মৃত্যুর তদন্ত করে পুলিশ। অস্বাভাবিক মৃত্যু মানে আত্মহত্যা, দুর্ঘটনার কারণে মৃত্যু বা হত্যা— সব কিছু হতে পারে। পুলিশ আধিকারিক বরুণ সরকার হলেন বাস্তবের প্রথম গোয়েন্দা।
বরুণ 'সরেজমিনে তদন্ত' করলেন। জেরা করলেন অয়ন আর প্রাপ্তিকে। ইতিমধ্যে চলে এসেছে পুলিশের ফরেন্সিক টিম। অপরাধ হলে বা দুর্ঘটনা ঘটলে অকুস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহ করা এবং নমুনা যাতে নষ্ট না হয়, তার জন্য ঘটনাস্থল ঘিরে রাখাই তাঁদের কাজ। তাঁরা ক্রাইম সিনে আঙুলের ছাপ খুঁজছেন, বারুদ বা রক্তের নমুনা সংগ্রহ করে এভিডেন্স ব্যাগে ভরছেন।
ইতিমধ্যে দু'টি মৃতদেহ 'বডি ব্যাগ' বা 'ক্যাডাভার ব্যাগ'-এ (ক্যাডাভার মানে মৃতদেহ) ভরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে মেডিকেল কলেজের 'ফরেন্সিক মেডিসিন' বা 'আইনি চিকিৎসাবিদ্যা' বিভাগে। সঙ্গে গেছে 'সুরতহাল রিপোর্ট।'
'সুরতহাল'। নতুন শব্দ! আরবি ভাষায় 'সুরত' শব্দটির অর্থ চেহারা বা আকৃতি। আরবি 'হাল' শব্দের অর্থ বর্তমান কাল। সুরতহাল শব্দের অর্থ হল এখনকার চেহারা নির্ধারণের চেষ্টা। ইংরেজিতে বলা হয় 'ইনকোয়েস্ট রিপোর্ট'। ময়নাতদন্তের ডাক্তারের কাছে অস্বাভাবিক মৃত্যুর পটভূমি, ভিসেরা সংরক্ষণের অনুরোধ এবং অন্যান্য তথ্য লেখা যে কাগজটি যায় সেটিই হল সুরতহাল বা ইনকোয়েস্ট রিপোর্ট। মৃতদেহ কী অবস্থায়, কোথায় পাওয়া গেছে তার বিস্তারিত বর্ণনা থাকে এই রিপোর্টে।
আমি যখন ময়নাতদন্ত করি, তখন মৃতদেহ দেখার আগে মন দিয়ে পড়ি ইনকোয়েস্ট রিপোর্ট। ভাল ইনকোয়েস্ট রিপোর্ট পড়লে প্রাথমিক ধারণা হয় যে, এটি খুন, আত্মহত্যা, দুর্ঘটনার কারণে মৃত্যু না হাসপাতালে ভর্তি থাকাকালীন

কোথায়, কী ভাবে পাওয়া গেছে মৃতদেহ?

স্বাভাবিক মৃত্যু। এই প্রচ্ছদকাহিনির জন্য নিজের অভিজ্ঞতা ব্যবহার করলেও অটোপ্সি সার্জেন হিসেবে তৈরি করেছি একটি কাল্পনিক চরিত্র। ময়নাতদন্তের চিকিৎসক বা পোস্টমর্টেম সার্জেন ডক্টর দীপশিখা মুখোপাধ্যায় হলেন এই কাহিনির দ্বিতীয় গোয়েন্দা।
দীপশিখা মৃতদেহ পরীক্ষা করে জানিয়ে দিলেন যে, প্রথমে সুশান্তর মুখে বালিশ চাপা দিয়ে খুনের চেষ্টা করা হয়, যাকে কেতাবি ভাষায় বলে 'স্মদারিং'। সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে সরু প্লাস্টিকের তার গলায় পেঁচিয়ে খুন করা হয়, যাকে বলে 'স্ট্রাঙ্গুলেশান'। তার পরে তাঁকে সিলিং থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। অর্থাৎ 'হ্যাঙ্গিং।' যাতে সবাই ভাবে, এটি আত্মহত্যা।
পল্টুর ক্ষেত্রে অন্য পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। তাকে ঘুমের ওষুধ খাওয়ানো হয়েছিল। অর্থাৎ 'পয়জনিং'। পরে মাথায় গুলি করে মারা হয়। অর্থাৎ 'গানশট ইনজুরি'।
সুশান্তর নখের ফাঁকে সরু চামড়ার ফালি পাওয়া গেছে। সেটা হয়তো ধস্তাধস্তির সময় খুনির শরীর থেকে এসেছে। ফরেন্সিক মেডিসিনে 'লোকার্ডস এক্সচেঞ্জ প্রিন্সিপ্‌ল' বলে একটি নিয়ম আছে। সেটি বলে যে, যখন দু'টি বস্তু পরস্পরের সংস্পর্শে আসে, তখন দু'টি বস্তু থেকেই কিছু না-কিছু অন্য বস্তুতে স্থানান্তরিত হয়। মোদ্দা কথা হল, অকুস্থলে অপরাধী চিহ্ন রেখে যায় এবং সঙ্গে কোনও চিহ্ন নিয়ে যায়। এবং সেটা খুঁজে পাওয়াই ফরেন্সিক মেডিসিনের বিশেষজ্ঞদের কাজ।

ময়নাতদন্ত

দুটো নতুন শব্দ পাওয়া গেল। 'ময়নাতদন্ত' আর 'পোস্ট মর্টেম'। ল্যাটিন ভাষায় 'মর্টেম' শব্দের অর্থ 'মৃত্যু'। 'পোস্ট' শব্দের অর্থ 'পরে'। দু'টি শব্দ মিলে 'পোস্ট মর্টেম' শব্দবন্ধ তৈরি হল, যার মানে 'মৃত্যুর পরে'। আর কেতাবি মানে হল, 'মৃত্যুর কারণ নির্ধারণের জন্য মৃতদেহের পরীক্ষা'। বাংলায় ময়নাতদন্ত।
বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত 'ময়না' শব্দের একাধিক অর্থ থাকলেও আদতে শব্দটির উৎসে আছে আরবি শব্দ 'মু আইনা', যার অর্থ, 'চোখ দিয়ে' বা 'প্রত্যক্ষ ভাবে'। বাংলায় এসে শব্দটি আসল রূপ হারিয়ে ময়না হয়ে গেলেও অন্তর্নিহিত অর্থ হারায়নি। মু আইনা-র সঙ্গে সংস্কৃত শব্দ 'তদন্ত' জুড়ে তৈরি হয়েছে ময়নাতদন্ত, যার অর্থ 'অস্বাভাবিক মৃত্যুর কারণ উদ্ঘাটনের উদ্দেশ্যে শব ব্যবচ্ছেদ'। এ ভাবেই পোস্ট মর্টেম আর ময়নাতদন্ত মিলেমিশে গেছে।
পুরুলিয়ার দেবেন মাহাতো মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটালের ফরেন্সিক মেডিসিন বিভাগের প্রধান ডা. পরাগবরণ পাল জানাচ্ছেন, "প্রতিটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর ক্ষেত্রে, অথবা স্বাভাবিক মৃত্যু মনে হলেও মৃত্যুর কারণ নিয়ে সন্দেহ দেখা দিলে মৃত্যুর কারণ নির্ণয়ের জন্যে ময়নাতদন্ত করা হয়।"
আবার ফিরে যাই কাল্পনিক চরিত্র দীপশিখার কাছে। তিনি প্রথমে সুরতহাল পড়ে বুঝে নেন, মৃতদেহ দু'টির পরিচয় কী এবং কী অবস্থায় তাদের পাওয়া গিয়েছিল।
এই নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে মৃতদেহের পরিচয় জানা গেছে। অনেক ক্ষেত্রে 'আননোন বডি' বা পরিচয়বিহীন মৃতদেহ এলে পরিচয় খুঁজে বের করা হল প্রথম সমস্যা। কখনও কখনও পচাগলা মৃতদেহ আসে। তার বয়স, লিঙ্গ— কিছুই বোঝা যায় না। তখন পরনের পোশাক, ট্যাটু, উল্কি, কাটা দাগ, বাঁধানো দাঁত, আঙুলের ছাপ ইত্যাদি দেখে পরিচয় বের করা হয়।
যে সব মৃতদেহের ক্ষেত্রে পরিচয় খুঁজে পাওয়া যায় না, সেগুলো একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ফ্রিজারে রেখে দেওয়া হয়। এদের 'বেওয়ারিশ লাশ' বলা হয়। কখনও কেউ থানায় মিসিং পার্সনস ডায়েরি করলে তাঁকে এই সব বেওয়ারিশ লাশ ড্রয়ার খুলে দেখানো হয়।
এখানে নিউজ় পোর্টাল থেকে একটা খবর তুলে ধরি। পার্ক স্ট্রিট এলাকার হোটেল থেকে নিখোঁজ হয়েছিলেন দিল্লির জনৈক বাসিন্দা। পরিবারের তরফে থানায় 'মিসিং পার্সনস ডায়েরি' করা হয়। দিন পাঁচেক পরে গঙ্গার বাজেকদমতলা ঘাট থেকে পচাগলা, দাবিদারহীন এক যুবকের দেহ উদ্ধার করেন উত্তর বন্দর থানার পুলিশকর্মীরা। তবে মৃতদেহটি যে দিল্লির ওই ব্যক্তির, সেটা জানতে আরও কয়েক দিন লেগে যায়। অর্থাৎ বেওয়ারিশ লাশের সংখ্যা একটি বাড়া মানেই একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর সমাধান না হওয়া।

ফরেন্সিক মেডিসিন বিশেষজ্ঞের কাজ অপরাধের চিহ্ন খুজে বের করা

মৃতদেহের পরিচয় খুঁজে বের করাই প্রথম সমস্যা
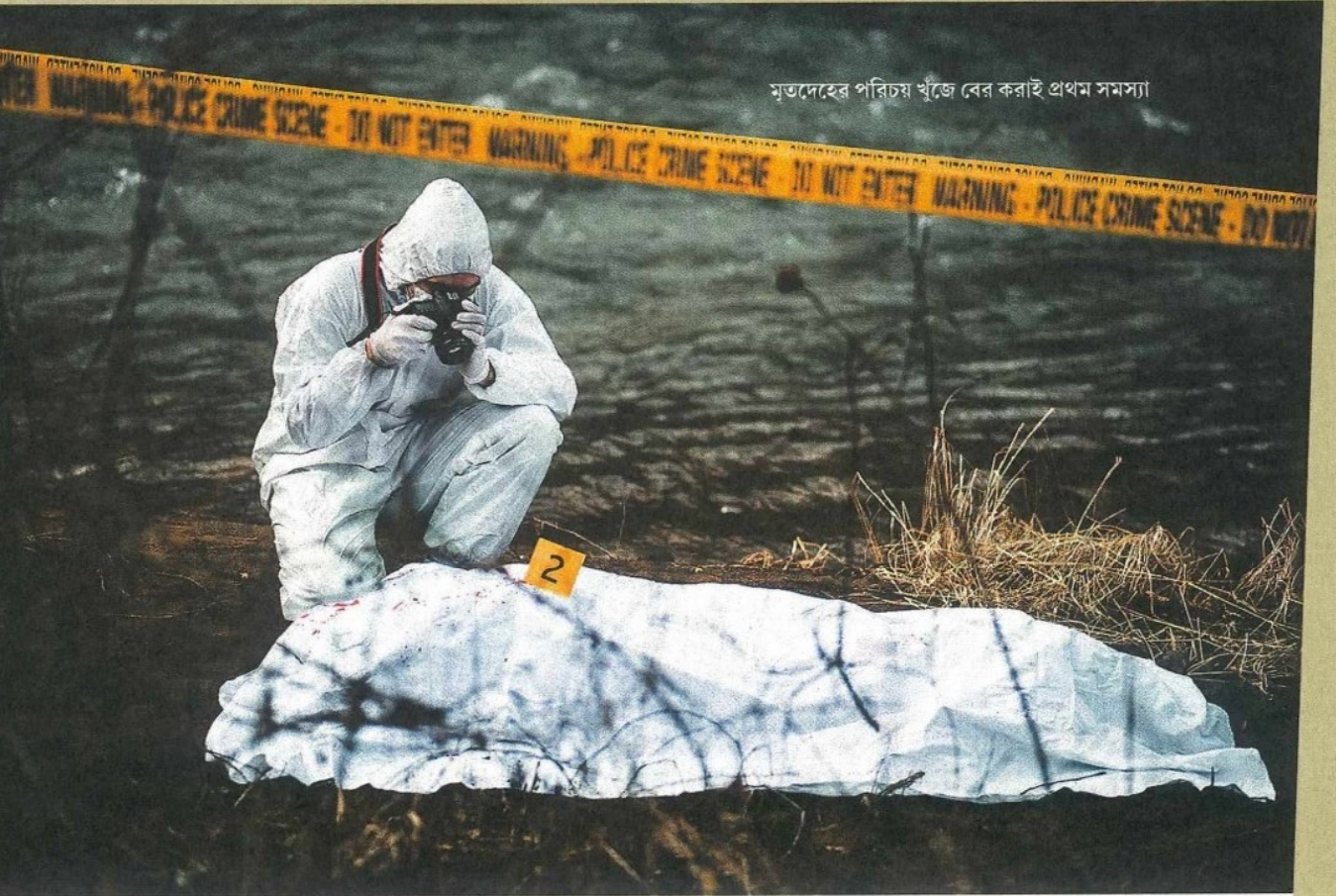
অটোপ্সি সার্জন দীপশিখা কী দেখলেন? তিনি দেখলেন, দু'টি দেহের কোথায় কোথায় আঘাত আছে। ত্বক, জিভ আর চোখের মণির রং কী। গলায় দড়ির দাগ, মারের দাগ, গুলি চলা বা ভোজালির ক্ষতর দাগ আছে কি না। হাড় ভেঙেছে না ভাঙেনি... সব কিছু। সেই পর্ব চুকিয়ে দু'টি মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করে মস্তিষ্ক, ফুসফুস, যকৃৎ-সহ শরীরের ভিতরটা যাচাই করলেন। দু'টি মৃতদেহের পাকস্থলী ও ক্ষুদ্রান্ত্রের শুরুর অংশটি রাখলেন একটি পাত্রে। যকৃৎ, প্লীহা এবং দু'টি বৃক্কের অংশ বিশেষ রাখলেন অন্য পাত্রে। আর নিলেন মাথার চুল, নখের টুকরো, রক্ত আর চামড়ার টুকরো। এবং এই সব পাঠিয়ে দিলেন ফরেন্সিক ল্যাবরেটরিতে, রাসায়নিক পরীক্ষার জন্যে। সুশান্তের আঙুলের ফাঁকে লেগে থাকা চামড়াও পাঠালেন ডিএনএ পরীক্ষার জন্য। পল্টুর মাথায় গেঁথে থাকা বুলেট পাঠালেন 'ব্যালিস্টিক্স' দপ্তরে। ময়নাতদন্ত শেষ হলে ক্ষতচিহ্ন সেলাই করে মৃতদেহ দু'টিকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে সুশান্ত ও পল্টুর বাড়ির লোকের হাতে তুলে দেওয়া হল।

ময়নাতদন্তের ফলে তিনটি প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল। কে মারা গেছে, কী ভাবে মারা গেছে এবং কখন মারা গেছে। ভিসেরার কেমিক্যাল অ্যানালিসিস রিপোর্ট, ব্যালিস্টিক্স রিপোর্ট এবং ডিএনএ পরীক্ষার রিপোর্ট এলে আরও কিছু তথ্য জানা যাবে। সে বিষয়ে পরে আসছি। তার আগে একটা ব্যতিক্রমী কথা বলা জরুরি। ময়নাতদন্তের পরে মৃতদেহ হাতে পেয়ে আত্মীয়স্বজন নিজের ধর্ম অনুযায়ী পারলৌকিক ক্রিয়া করেন। কোনও ধর্মে মৃতদেহ দাহ করা হয়। কোনও ধর্মে কবর দেওয়া হয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মৃতদেহ দীর্ঘ কাল মাটির নীচে থেকে যায়। ভবিষ্যতে মৃত্যুর কারণ নিয়ে সন্দেহ দেখা দিলে মৃতদেহ তুলে আবার ময়নাতদন্ত করা হয়। একে বলে 'এগজ়িউমেশান' বা 'গ্রেভ ডিগিং'। 'গোরস্থানে সাবধান' উপন্যাসে সিধুজ্যাঠা ফেলুদাকে বলেছিলেন, "বলো কী হে! গ্রেভ ডিগিং? এ তো ভারী গ্রেভ সংবাদ দিলে হে তুমি।" ... মনে পড়ে?

বিষে বিষক্ষয়

সুশান্ত ও পল্টুর শরীরের নানা অংশ রাসায়নিক পরীক্ষার জন্যে পাঠানো হল ফরেন্সিক ল্যাবরেটরিতে। সেটা কোথায়? রাজ্য সরকারের 'ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি' কলকাতায় তৈরি হয় ১৯৫২ সালে। এবং এটিই ভারতের প্রথম ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাব। মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের মস্তিষ্কপ্রসূত প্রতিষ্ঠানটি ছাড়াও কলকাতায় রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিষ্ঠান, 'সেন্ট্রাল ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি'। এই দু'টি প্রতিষ্ঠানে বাংলার প্রতিটি জেলা থেকে রোজ অজস্র ভিসেরা আসে রাসায়নিক পরীক্ষার জন্যে। আমিও পাঠাই। কাজের চাপ সাংঘাতিক। এখানেই বিষ নির্ণয় করা হয়। এই কাজ যাঁরা করেন, তাঁরা হলেন বাস্তবের তৃতীয় গোয়েন্দা।

বিজ্ঞানের যে শাখা বিষের প্রকৃতি, প্রভাব এবং শনাক্তকরণের সঙ্গে সম্পর্কিত, তাকেই টক্সিকোলজি বা বিষ-বিজ্ঞান বলে। কোনও ব্যক্তির শরীরে উপস্থিত সম্ভাব্য টক্সিন, নেশার দ্রব্য, নিষিদ্ধ পদার্থ এবং প্রেসক্রিপশনে লেখা ওষুধের

ফরেন্সিক ল্যাবরেটরিতে রাসায়নিক পরীক্ষার সরঞ্জাম

পরিমাপ এবং বিশ্লেষণ করে এই শাখা। ফরেন্সিক মেডিসিনের বিভাগীয় প্রধান ডা. পালের কথা অনুযায়ী অনেক সময়েই বিষ প্রয়োগে মৃত্যু সত্ত্বেও মৃতের শরীরে বিষ পাওয়া যায় না। তার কারণ হল:
১। বমি বা পটির সঙ্গে বিষ শরীর থেকে বেরিয়ে গেছে।
২। ফুসফুস দিয়ে বাষ্পীভূত হয়ে গেছে।
৩। গাছপালা থেকে পাওয়া ক্ষার জাতীয় বিষ রাসায়নিক পরীক্ষায় ধরা পড়ে না।
৪। কিছু কিছু বিষ খুব দ্রুত বিপাক ক্রিয়ার মাধ্যমে শরীর থেকে বেরিয়ে যায়।
৫। ভুল স্যাম্পেল পাঠানো হয়েছে।
৬। ভুল ভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে।
উল্টোটাও হতে পারে। কাউকে বিষ প্রয়োগের মাধ্যমে হত্যা করা হয়নি, কিন্তু তার শরীরে বিষ পাওয়া গেল। একে বলে ফল্‌স পজ়িটিভ রেজ়াল্ট। যেমন:
১। খাবার, জল বা বাতাসের সঙ্গে আমাদের শরীরে নানা বিষ ঢোকে। যেমন, বাংলার কিছু এলাকায় আর্সেনিক দূষণ আছে। সেখানকার কাউকে আর্সেনিক প্রয়োগে খুন করলে বুঝতে পারা শক্ত। তবে পরিমাণ পরীক্ষা করলে বোঝা যাবে।
২। মৃতদেহ পচে গেলে শরীরে মিথেন, হাইড্রোজেন সালফাইড, অ্যালকোহল, কার্বন মনোক্সাইড বা কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি হয়। এগুলোকে বিষ বলে মনে হতে পারে।
৩। পাকস্থলীর সঙ্গে রক্তের বা অন্য কোনও নমুনা মিশে গেলেও ফল্‌স পজ়িটিভ রেজ়াল্ট আসতে পারে। এ সব ক্ষেত্রে দোষী ছাড়া পেয়ে যেতে পারে অথবা নিরপরাধ ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হতে পারে। তবে এই রকম ঘটনা ঘটে না বললেই চলে।
আমাদের গল্পে অবশ্য এ রকম কিছু

বৈশিষ্ট্য	প্রবেশ ক্ষত	প্রস্থান ক্ষত
ক্ষতের আয়তন	কার্তুজ়ের ব্যাসের চেয়ে ছোট	কার্তুজ়ের ব্যাসের চেয়ে বড়
ক্ষতের ধার	শরীরের ভিতরের দিকে মুখ করে থাকে	শরীরের বাইরের দিকে মুখ করে থাকে
কালশিটে, ছড়ে যাওয়া, তেলকালির দাগ	থাকে	থাকে না
পুড়ে যাওয়া, কালো হয়ে যাওয়া, ট্যাটুর মতো দাগ হওয়া	হয়	হয় না
রক্তপাত	কম	বেশি

	আত্মহত্যা	দুর্ঘটনা	হত্যা
প্রবেশ ক্ষত	মস্তিষ্ক অথবা হৃদয়	যে-কোনও জায়গা	যে-কোনও জায়গা
ক্ষতর সংখ্যা	সাধারণত এক	এক	এক বা অনেক
বুলেটের গতিপথ	উপর বা পিছন দিকে	যে-কোনও দিকে	সাধারণত উপর দিকে
শরীর থেকে নলের দূরত্ব	কনট্যাক্ট বা ক্লোজ় রেঞ্জ	ক্লোজ় বা খুব ক্লোজ় রেঞ্জ	যে-কোনও রেঞ্জ
যে হাত দিয়ে ট্রিগার টেপা হয়েছে	সেই হাতের আঙুলে কার্তুজের পাউডার লেগে থাকবে	থাকবে	থাকবে না
আগ্নেয়াস্ত্র	অকুস্থলে মজুত থাকে	থাকে	না থাকার সম্ভাবনা বেশি
মোটিভ	মানসিক রোগ, দুরারোগ্য ব্যাধি, অর্থনৈতিক সমস্যা	নেই	ডাকাতি, দলগত শত্রুতা, প্রতিশোধ ইত্যাদি

হয়নি। ভিসেরার রাসায়নিক পরীক্ষা করে সুশান্তর শরীরে বিষ পাওয়া না-গেলেও পল্টুর রক্তে অতিরিক্ত মাত্রায় ঘুমের ওষুধ পাওয়া যায়। দীপশিখা এবং বরুণ আন্দাজ করেন যে, হত্যাকারী পল্টুর চেনা। দু'জনে সেই সন্ধেয় এক সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করেছিল। হত্যাকারী পল্টুর খাবারে বেশি পরিমাণে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছিল। ভেবেছিল এই ভাবেই পল্টু মারা যাবে। সেটা না হওয়ায় পল্টুর মাথায় গুলি করে।

ঢিচক্যাঁও

গুলি চালানো থেকে আমরা চলে এসেছি 'ফরেন্সিক ব্যালিস্টিক্স' প্রসঙ্গে। এই কাজটা যাঁরা করেন, তাঁরা হলেন বাস্তবের পঞ্চম গোয়েন্দা। ফরেন্সিক মেডিসিনের বিভাগীয় প্রধান ডা. পাল বললেন, "বিজ্ঞানের এই শাখাটি অপরাধের সঙ্গে যুক্ত আগ্নেয়াস্ত্র থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করে। বাংলায় 'আগ্নেয়াস্ত্র বিজ্ঞান' বলা যেতে পারে।" অপরাধের কাজে ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্র দু'রকমের হয়। স্মুদ বোর্‌ড ওয়েপন এবং রাইফেল্‌ড ওয়েপন। ব্যারেল বা নলের ভিতর দিক যদি মসৃণ হয়, তা হলে তাকে স্মুদ বোর্‌ড ওয়েপন বলে। এর মধ্যে পড়ে সিঙ্গল ব্যারেল, ডাবল ব্যারেল, বোল্ট অ্যাকশান, সেমি-অটোমেটিক বা অটোমেটিক ওয়েপন। রাইফেলড ওয়েপনের নলের ভিতর দিকে খাঁজ কাটা থাকে, (ক্রিয়াপদ 'রাইফেল' মানে সর্পিল খাঁজ) যাতে কার্তুজ় ঘুরতে ঘুরতে নল থেকে বেরোয়। এই ঘুরন্ত কার্তুজ় মানব শরীরে ঢোকার সময় কোষ ও কলা ছিঁড়তে ছিঁড়তে যায় বলে শরীরের ক্ষতি বেশি হয়। রাইফেলের মধ্যে পড়ে পয়েন্ট টু টু রাইফেল, মিলিটারি আর স্পোর্টিং রাইফেল, সিঙ্গল শট টার্গেট প্র্যাকটিস পিস্তল, রিভলভার, অটোমেটিক পিস্তল। কারও কার্তুজের ক্ষত পরীক্ষার সময় আমি নির্দিষ্ট কয়েকটা জিনিস দেখি। সেগুলো হল, বুলেটের সাইজ় কত, কী ধরনের বিস্ফোরক এবং আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে এবং কত দূর থেকে গুলি চালানো হয়েছে। শেষ বিষয়টির নানা রকমের ভাগ আছে।

এক নম্বর হল 'কনট্যাক্ট শট'। এই শটে মাজ়ল বা নল থেকে বেরোনো গ্যাস, আগুনের ঝলক, পাউডার, ধোঁয়া আর ধাতব পদার্থ সরাসরি মানব শরীরে ঢুকে যায়। চামড়ায় বা চামড়ার ঠিক ভিতরে এগুলো পেলে বোঝা যায় যে শরীরে নল ঠেকিয়ে গুলি করা হয়েছে।

দু'নম্বর হল 'ক্লোজ় শট' বা 'পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ'। টার্গেটের পাঁচ থেকে আট সেন্টিমিটার দূরত্বের মধ্যে গুলিটি করা হয়। 'নিয়ার শট' হল তিন নম্বর। কার্তুজের সঙ্গে ছড়িয়ে যাওয়া পাউডার ভিকটিমের শরীর পর্যন্ত পৌঁছোচ্ছে, কিন্তু আগুন পৌঁছোচ্ছে না। ন্যূনতম ষাট সেন্টিমিটার দূরত্ব থেকে গুলি করলে এটা হয়।

চার নম্বর হল 'ডিসট্যান্ট' শট। এই ক্ষেত্রে কার্তুজ় প্রবেশের সময় যে ক্ষত তৈরি হয়, সেটি বুলেটের মাপের চেয়ে ছোট। দূর থেকে আসছে বলে চামড়াকে ভিতর দিকে কিছুটা টেনে নিয়ে যায় কার্তুজ়। ফলে কী রকমের বুলেট থেকে গুলি বেরিয়েছে, সেটা বোঝা যায় না।

বুলেট শরীরে ঢোকার সময় যে ক্ষত তৈরি হয় তাকে বলে 'এনট্রি উন্ড' বা 'প্রবেশ ক্ষত' আর বেরিয়ে যাওয়ার সময় যে ক্ষত তৈরি হয়, তাকে বলে 'এগজ়িট উন্ড' বা 'প্রস্থান ক্ষত।' দুটো কী ভাবে আলাদা করতে হয়, সেটা জানা জরুরি।

পল্টুর শরীর থেকে দীপশিখার সংগ্রহ করা বুলেট ব্যালিস্টিক্স এক্সপার্টের হাতে পড়েছে। তিনি বলেছেন যে, দেশি আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে খুন করা হয়েছে। এই রকম আগ্নেয়াস্ত্রের ক্ষেত্রে বন্দুকের মালিকের সন্ধান পাওয়া যাবে না।

কেউ আগ্নেয়াস্ত্রের গুলিতে মারা গেলে সেটা আত্মহত্যা, দুর্ঘটনা না হত্যা? সেটা বলে দেওয়া খুব সোজা। কী ভাবে? জেনে নাও।

ব্যালিস্টিক্স নিয়ে আলোচনা শেষ করার আগে ইন্টারেস্টিং দুটো কথা বলি। অন্ধ্রপ্রদেশের রায়ালাসিমা জেলায় এক ব্যক্তিকে ছুরির আঘাতে খুন করে তার ক্ষতে বুলেট ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এটা করার কারণ পুলিশকে ভুল পথে পরিচালনা করা। কিন্তু বাস্তবের

বৈশিষ্ট্য	ফাঁসি বা আত্মহত্যা	দড়ি বা তার দিয়ে শ্বাসরোধ
গলায় দাগ	আঁকাবাঁকা, পুরো গলা জুড়ে থাকে না। থুতনি আর স্বরযন্ত্র বা ল্যারিংক্স-এর মাঝামাঝি দাগ থাকে	আড়াআড়ি ভাবে পুরো গলা জুড়ে, থাইরয়েড তরুণাস্থির নীচে দাগ থাকে
ছড়ে যাওয়া ও রক্ত জমে যাওয়ার ছিটছিট দাগ	ফাঁসের দাগের দু'পাশে না দেখা যাওয়াই স্বাভাবিক	দেখা যায়
ক্ষত	ঘাড়ের পেশিতে দেখা যায় না	দেখা যায়
গলা	লম্বা হয়ে যায়	হয় না
হাইয়য়েড অস্থি	ভেঙে যেতে পারে	ভাঙে না
থাইরয়েড তরুণাস্থি	ভাঙে না	ভেঙে যেতে পারে
মুখ	বিবর্ণ থাকে	লালচে হয়ে যায়
গ্যাঁজলা বা থুতু	মুখের কোণ বেয়ে গড়াতে থাকে	থাকে না
নাক-মুখ দিয়ে রক্তপাত	হয় না	হয়

সাক্ষ্যপ্রমাণ জোগাড় করা হয় যে ধরনের ব্যাগে

গোয়েন্দারা অত বোকা না। তাঁরা এটি ধরে ফেলেন। এই ঘটনাকে বলা হয় 'রায়ালাসিমা ফেনোমেনা'।
আর একটা মজার তথ্য। বন্দুক থেকে কার্তুজ বেরিয়ে যাওয়ার পরে সেটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে না-লেগে অন্য দিকে ঘুরে যায়, তখন তাকে 'রিকোশেট বুলেট' বলে। এই ক্ষেত্রে ব্যালিস্টিক এক্সপার্ট অসুবিধেয় পড়েন। বাকি সব হিসেব মিললেও বুলেট যেখানে পাওয়ার কথা, সেখানে পাওয়া যায় না।

রুদ্ধশ্বাস

প্রথমে সুশান্তর নাকে-মুখে বালিশ চাপা দিয়ে হত্যার চেষ্টা হয়। একে বলে 'স্মদারিং'। সেই চেষ্টা ব্যর্থ হলে গলায় সরু প্লাস্টিকের তার জড়িয়ে হত্যা করা হয়। একে বলে 'স্ট্র্যাঙ্গুলেশান'। পরে তাঁকে সিলিং থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। যাকে বলে 'হ্যাঙ্গিং'। দেখা যাচ্ছে, শ্বাসরোধের ফলে অস্বাভাবিক মৃত্যুর নানান ধরন আছে। যেমন ধরো 'সাফোকেশান'। যেখানে একটি ঘরে বিষাক্ত বাষ্প জমে দম আটকে মৃত্যু হয়। রমাপদ চৌধুরীর লেখা বড়দের উপন্যাস 'খারিজ'। সেই উপন্যাসে শীতের রাতে পালান নামে একটি বাচ্চা দরজা-জানলা বন্ধ ঘরে উনুন জ্বালিয়ে ঘুমোচ্ছিল। ছোট্ট ঘরে কার্বন মনোক্সাইড জমে বাচ্চাটি মারা যায়। এই হল সাফোকেশানের উদাহরণ। মুখের মধ্যে কিছু ঢুকিয়ে শ্বাসরোধ করে যে মৃত্যু, তাকে বলে 'গ্যাগিং'। এটা খুন।

আমি ময়নাতদন্ত করার সময় নিয়মিত 'গলায় দড়ি দিয়ে মৃত্যু' বা হ্যাঙ্গিংয়ের মৃতদেহ পাই। প্রায় সব ক্ষেত্রেই এটি আত্মহত্যা হয়ে থাকে। সুশান্তর মতো কোনও কোনও ক্ষেত্রে গলায় ফাঁস টেনে খুন করার পরে সিলিংয়ের হুক থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। শ্বাসরোধ করে মৃত্যুর আরও নানা পদ্ধতি আছে। যেমন, চোকিং, মাগিং, বাঁশডলা বা জলে ডুবে মৃত্যু। এই সবের মধ্যে থেকে বেছে নিলাম চোকিংয়ের একটি বাস্তব উদাহরণ। যার নাম 'ক্যাফে করোনারি'।
এয়ার মার্শাল সুব্রত মুখোপাধ্যায় ভারতীয় বিমান বাহিনীর প্রথম কমান্ডার-ইন-চিফ ছিলেন। তাঁকে 'ভারতীয় বিমান বাহিনীর জনক' বলা হয়। ১৯৬০ সালে ভারতীয় নৌবাহিনীর এক অফিসার-বন্ধুর সঙ্গে জাপানের রেস্তরাঁয় খাওয়া-দাওয়ার সময় এক টুকরো খাবার তাঁর শ্বাসনালীতে আটকে যায়। কোনও ডাক্তার আসার আগেই তিনি মারা যান। রেস্তরাঁয় খাওয়ার সময় শ্বাসনালীতে

খাবার আটকে মৃত্যু বা 'চোকিং'-এর কেতাবি নাম হল 'ক্যাফে করোনারি'।
আমাদের গল্পে সুশান্ত গলায় দড়ি দেওয়া অবস্থায় ঝুলছিলেন। ময়নাতদন্তের সময় দীপশিখা কী ভাবে বুঝলেন যে এটি আত্মহত্যা না হত্যা? এসো, জেনে নিই যুক্তিগুলো।

সেন্ট্রাল ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে পিস্তলের সম্ভার

অপরাধী চিহ্ন রেখে যায়

ফিরে যাওয়া যাক পুলিশ আধিকারিক বরুণের কাছে। তিনি মল্লিক ভবনের সিসিটিভি ফুটেজ দেখেছেন। তাতে দেখা গেছে, ছ'ফুটের উপরে লম্বা এক ব্যক্তিকে রাত আটটার সময় বাড়িতে ঢুকতে দেয় পল্টু। লোকটি একাকী বেরিয়ে যায় রাত দশটায়। এই দু'ঘণ্টার মধ্যেই জোড়া খুন হয়েছিল। অয়ন এবং প্রাপ্তি যে ওই সময়সীমার মধ্যে রেনেসাঁস ক্লাবে ছিল, সেটা ক্লাবের সিসিটিভি ফুটেজ থেকে প্রমাণিত হয়।
প্রতিটি সফল পুলিশের নিজস্ব 'সোর্স' থাকে। এদের হিন্দিতে 'খব্‌রি,' ইংরিজিতে 'ইনফর্মার,' বাংলায় 'চর' বলা হয়। সে রকম একাধিক সোর্সের সঙ্গে যোগাযোগ করে বরুণ জানতে পারলেন যে, বালিগঞ্জের মতো দুর্দান্ত জায়গায় অত বড় বাগানওয়ালা বাড়ির প্রতি স্থানীয় প্রোমোটার গোপাল সিংহের লোভ ছিল। বাড়ি বেচার প্রস্তাব নিয়ে সে অতীতে সুশান্তর কাছে একাধিক বার এসেছে। প্রত্যেক বারই সুশান্ত তাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন।
প্রোমোটার গোপাল সিংহ ও তার শাগরেদ মুন্না সিংহ— দু'জনেই ছ'ফুটের উপরে লম্বা। দু'জনকেই গ্রেফতার করলেন বরুণ। ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের খুনের ধারা দিয়ে কোর্টে পেশ করলেন। খুনের সময় এরা কোথায় ছিল, তার কোনও নির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবে বরুণের সরেজমিনে তদন্ত আর জেরা, দীপশিখার ময়নাতদন্তের রিপোর্ট, বিভিন্ন সিসিটিভি ফুটেজ, ব্যালিস্টিক্স রিপোর্ট, ভিসেরার কেমিক্যাল অ্যানালিসিস রিপোর্ট পড়লে আন্দাজ করা যায় যে, সিসিটিভি ফুটেজে দেখা লম্বা লোকটাই খুনি। সেটা গোপাল বা মুন্না— যে কেউ হতে পারে।
কিন্তু আন্দাজের উপরে দাঁড়িয়ে বিচার-ব্যবস্থা কাজ করে না। এখন এক মাত্র ভরসা সুশান্তর নখের ফাঁকে লেগে থাকা চামড়ার ফালি। সেই স্যাম্পেলের ডিএনএ যদি গোপাল বা মুন্নার ডিএনএ-র সঙ্গে মিলে যায়, তা হলে ক্রাইম সিনে খুনির উপস্থিতি নিশ্চিত হয়।
কিন্তু এটা কাল্পনিক গোয়েন্দা গল্প নয়। এটা সত্যিকারের গোয়েন্দাদের গল্প। এখানে কোনও এক জন গোয়েন্দা নেই। আছে বিভিন্ন সরকারি আধিকারিকের একটা দল। তাঁরা সবাই মিলে কাজ করলেও একে-অপরকে চেনেন না। বালিগঞ্জের জোড়া খুনের পরে অনেক দিন পেরিয়ে গেল। সুশান্তর নখের ফাঁকে পাওয়া চামড়ার ডিএনএ পরীক্ষার রিপোর্ট এসে পৌঁছোল না। বরুণ খোঁজ নিয়ে জানলেন, দীর্ঘ কাল পড়ে থাকার ফলে এক রত্তি চামড়া পচে গেছে। সেটা থেকে ডিএনএ নিষ্কাশন সম্ভব নয়। ক্রাইম সিনে মুন্না বা গোপালের উপস্থিতির প্রমাণ না মেলায় ওরা বেকসুর ছাড়া পেয়ে গেল।
বালিগঞ্জের জোড়া খুন দিয়ে লেখাটি শুরু করেছিলাম। এই প্রচ্ছদকাহিনি নানান দফতরে পাক খেল বটে, কিন্তু অপরাধী ধরা পড়ল না। তবে এই গল্পের সঙ্গে চলতে চলতে তোমরা জেনে গেলে ফরেন্সিক মেডিসিন এবং ফরেন্সিক ল্যাবরেটরি কী ভাবে কাজ করে। এটা জানা জরুরি। তোমরা যদি গোয়েন্দা গল্প লিখতে চাও, তা হলে এই তথ্যগুলো তোমাদের সাহায্য করবে।
আর গোয়েন্দা গল্প পড়তে গিয়ে তথ্যে ভুল পেয়ে ফিক করে হেসে ফেলার মজাই আলাদা, তাই না?

তথ্যসূত্র:

১। https://www.anandabazar.com/west-bengal/kolkata/forensic-team-lalbazar-decided-to-form-separate-forensic-teams-in-each-division-of-kolkata-police/cid/1296101
২। https://www.anandabazar.com/west-bengal/kolkata/kolkata-police-will-get-tab-soon-to-recognize-bewarish-bodies-1.356152
৩। দ্য এসেনশিয়ালস অফ ফরেনসিক মেডিসিন অ্যান্ড টক্সিকোলজি, ড. কে এস নারায়ণ রেড্ডি এবং ড. ও পি মূর্তি, তেত্রিশতম সংস্করণ (২০১৪ সাল), দ্য হেলথ সায়েন্স পাবলিশার্স।
৪। রিভিউ অফ ফরেনসিক মেডিসিন অ্যান্ড টক্সিকোলজি, ইনক্লুডিং ক্লিনিকাল অ্যান্ড প্যাথলজিকাল অ্যাসপেক্টস, গৌতম বিশ্বাস, দ্বিতীয় সংস্করণ, (২০১২ সাল), জেপি ব্রাদার্স।
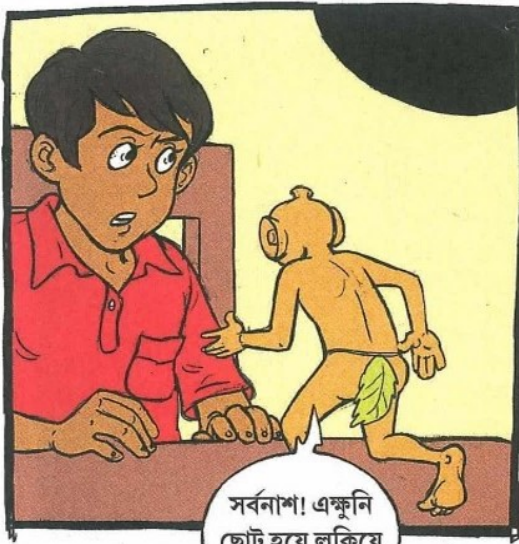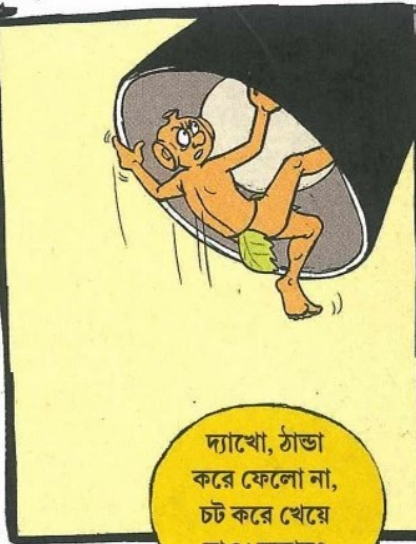
রেডি-স্টেডি-গো ডিগবাজি (পর্ব-৮)

কাহিনি ও ছবি: সুযোগ বন্দ্যোপাধ্যায়

বলছি ইয়ে, তোমার হেল্‌থ ড্রিঙ্কটা দেবে একটু?
মানে, তুমি যদি রাগ না করো, তা হলে একটু খেয়ে দেখতে চাই।
একটু কেন? তুমি কতটা খাবে খাও না! কে বারণ করছে তোমায়?
খেয়ে দেখি তো! আমার কেন জানি না, কী রকম সন্দেহ লাগছে।
মানুষ খারাপ হয়ে গেলেও বাচ্চাগুলো এখনও নষ্ট হয়ে যায়নি।
ড্রিঙ্কটা খাইয়ে দিয়েছ তো? অ্যাঁ? কী হল, চুপ করে রইলে কেন?
আমাকে তো বলল নিজে খেয়ে নেবে। তাই চলে এলাম দিদি!
অপদার্থ! যাও দেখে এসো, খেল কি না! যাও।
ছিঃ ছিঃ! অত্যন্ত জঘন্য ব্যাপার! ভাবা যাচ্ছে না।

কী জঘন্য ব্যাপার?
দুধটা বাজে খেতে,
এই তো?
সোনা, তোমার
দুধটা আমি
খাব?
থ্যাঙ্ক ইউ!
এখন থেকে আমাকে
দুধটা খেতে দেবে!
কেমন?
তোমার দুধটা
খেতে চাইছি।
তোমার রাগ
হচ্ছে না?
না, না! দুধ
অতি জঘন্য খেতে!
ওফ, বাঁচলুম!
এই রে,
কেউ আসছে!
সর্বনাশ!

ওমা, এটা আবার কী পুতুল! বাচ্চা টারজ়ান নাকি? বাজে দেখতে। এটাকে ফেলে দেব। বেরোনোর সময় নিয়ে যাব।
বা বা! মনে হচ্ছে মরা পাখি ধরেছি হাত দিয়ে।
মা-কে বলে দিলে ভীষণ বকা খাবে। তার চেয়ে আমি সটান বাইরে ফেলে দেব!
এটা ফেলো না। আমার খুব প্রিয় পুতুল!

(ক্রমশ)
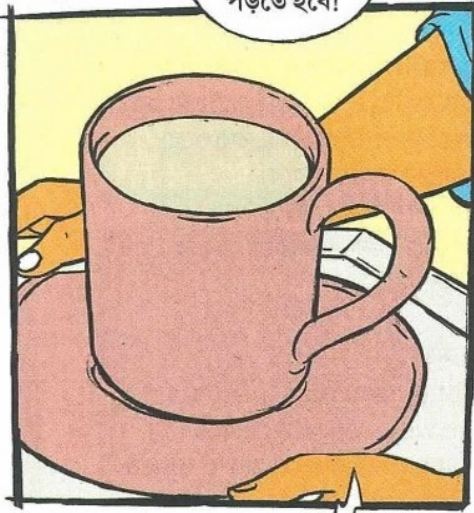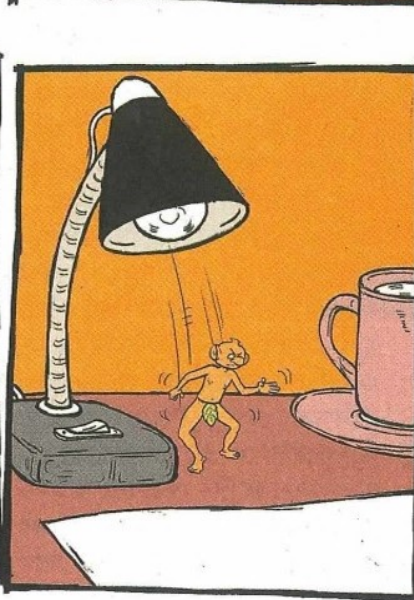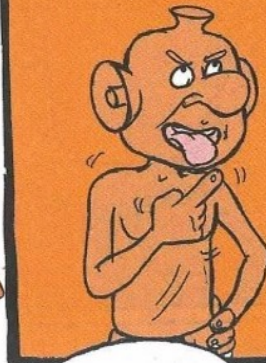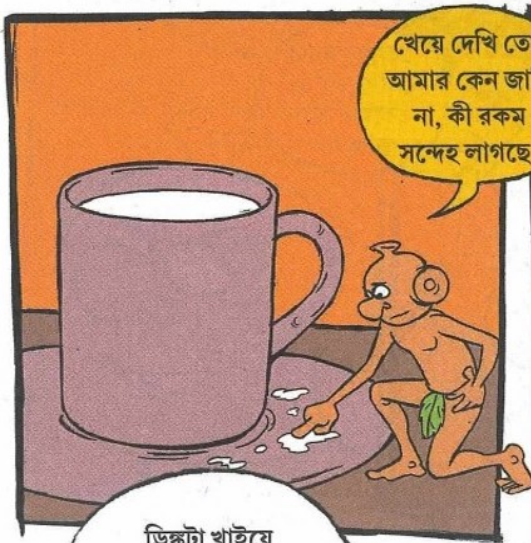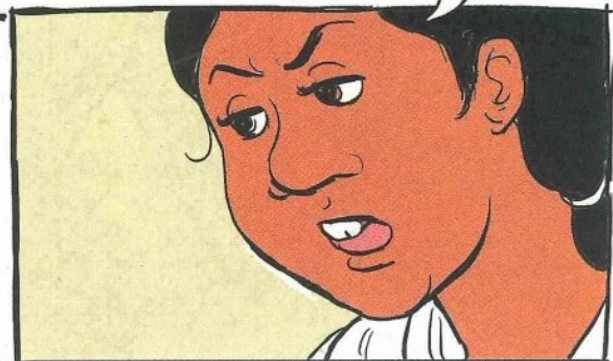
বনের গল্প

সেবন্তী ঘোষ

ওদের সঙ্গে আজ সুখদেও এসেছে। অন্য দিন সরিতা, মুঞ্জু, বিনসা, লিয়ং হাইওয়ে ধরে জঙ্গলে ঢোকার মুখে চেকপোস্টের সামনে নামে। আজ সুখু ওরফে সুখদেও চৌধুরী আসায় ওরা, বিশেষত মুঞ্জু উত্তেজিত।

সপ্তম শ্রেণিতে ওঠা অবধি এই প্রথম বাইরের কোনও বন্ধু ওদের কাছে রাতে থাকতে এল। দু'পাশে ঘন অরণ্যের মাঝে চকচকে জাতীয় সড়ক। মানুষে-বন্য পশুতে সংঘাত লেগেই আছে। ক'দিন আগেই ঘুরপথ হবে না বলে, গভীর বনপথে স্কুটি নিয়ে যাওয়ার সময় এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে আছাড় দিয়ে মেরেছে হাতি। ওরা সড়ক ছেড়ে পাশের ঢালু কাঁচা জমিতে নামে। সামনেই আড়াআড়ি শুধু একটা গাছের কাণ্ড চাপানো বন্ধ গেট। বিনা অনুমতিতে প্রবেশ নিষিদ্ধ বলে পাশে একটা রংচটা সাইনবোর্ডও আছে। বন দফতরের গাড়ি বা অনুমতি নেওয়া ভ্যান ছাড়া ভারী গাড়ি এই পথে নিষিদ্ধ। বস্তির বাইক-সাইকেলের জন্য বাবুলাল গেট খোলে না। গেটের একটা পাশে এক চিলতে পথ দিয়ে দু'চাকাগুলো ঢুকে যায়। বাবুলাল কাঠের বেঞ্চের উপর বসে মাথা ঝুঁকিয়ে ফোনে নেটওয়ার্ক খোঁজে। রাস্তার উল্টো দিকে জঙ্গলের ভিতরে আর্মি ক্যাম্প থাকায় অধিকাংশ সময় নেট কাজ করে না। ওদের দিকে মুখ তুলেও তাকায় না বাবুলাল।

গেটের পাশে শুকনো নালা বেয়ে ওরা আবার উপরে ওঠে। বেগুনি রঙের তুলোর মতো কানমারার ফুলে চার পাশ ছয়লাপ। মুঞ্জুরা গাছ লতা-পাতা দেখলে উসখুস করে না।

সুখদেও দূর বিস্তারিত ওই বেগনি ফুলের চাদর দেখে মুগ্ধ। বলে, "তোদের তা হলে কষ্ট করে বাগান করতে হয় না।"

লিয়ং আর সরিতা চোখাচোখি করে। বাইরের ছেলেমেয়েরা বনে এলেই এমন আদেখলাপনা করে। ওদের বন-বস্তির লোকেরা এই নিয়ে হাসাহাসি করে।

সরিতা বলে, "তুই যেন এমন ফুল দেখিসনি! তোর বাবা তো আর্মিতে। কত গভীর জঙ্গলের মধ্যে তোদের ক্যাম্প থাকে!"

ওই হাইওয়ের ও পারে আর্মির জলের ট্যাঙ্কে একটা বাচ্চা হাতি পড়ে ক'দিন আগে মারা গেছে।

সুখদেও এ বারে খাকি প্যান্ট থেকে ঘাসফুলের রোঁয়া ঝেড়ে বলে, "আমরা এমন বুনো জঙ্গলে থাকি না। এক দিন নিয়ে যাব তোদের। এই এত বড় বড় টবে পিটুনিয়া জার্বেরা ফোটে। হেবি কষ্ট টবে ফুল করার।"

জঙ্গলের ভিতরে কাঁচা পথে খানিকটা পর্যন্ত জল-কাদা জমে থাকে। পথের দু'পাশে গাড়ি যাওয়ার দাগ আর মাঝের উঁচু ঘাস-জমির উপর ছোট ছোট বুনো ফুল। ওরা জল-কাদা বাঁচিয়ে হাঁটে। খানিক বাদে গভীর অরণ্যের দিকে জিপের পথ চলে যায়, আর বাঁ দিকে মোটরবাইকের দাগওয়ালা পথ ধরে ওরা।

সুখদেও বলে, "তোরা স্কুটি না আনিস, সাইকেল তো আনতে পারিস! ওই সামনের মেন গেটে রেখে দিবি।"

বিনসা বলে, "ওই হাইওয়ের ধারে কিছু রাখা যায় নাকি? এমনিতেই আমাদের ওখানে এখন অনেক বাইক হয়েছে। দুধওয়ালা, মাছ-মাংসওয়ালা আসে, যায়। হাতি আছে অনেক। ওরা যানবাহনের শব্দ পছন্দ করে না। আমরা ঝামেলা না-বাড়িয়ে হেঁটে যাই। এইটুকু তো পথ। হাঁটতে কত ভাল লাগে। তা ছাড়া কত কী ব্যাগে ভরা যায়। ক'দিন পর ছয় নম্বর কম্পার্টে আম ধরবে, চালতা আনব।"

মুঞ্জু বলে, "আস্তে বল। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট বনের ফল নিলে রাগ করে। হাতির জন্য ওরা চালতা লাগায়।"

সুখদেও নাক কুঁচকে বলে, "হাতির জন্য আবার ফলমূল! শয়তান! সবার বাড়ি ঢুকে সুপুরি-কলাগাছ খেয়ে নেয়। হাড়বজ্জাত!"

সরিতা হাঁ হাঁ করে ওঠে। কপালে হাত ঠেকায়। বলে, "মহাকাল বাবা! ও ভাবে বলতে নেই, ওরা সব টের পায়। এখনই দেখবি পাশের ঝোপ থেকে এসে তোকে টেনে নিয়ে যাবে।"

মুঞ্জু সরিতার দিকে চোখ পাকায়। বনের ভিতর বস্তি বলে কোনও দিন একটা বাইরের বন্ধু আনতে পারে না। সন্ধে সাতটার পর ওরা আর ফার্স্ট, সেকেন্ড গেট পেরোতে পারে না। বিটবাবু বলেছে, কোর এরিয়া ওই দুই গেটের মাঝেই। কোর এরিয়া মানে জঙ্গলের মধ্যেখানেই হবে, এমনটা নয়।

ভূপেন হাজোয়ারি বসে। দু'পাশে অরণ্য গভীর হয়ে মাথার উপর ছাতার মতো ছায়া তৈরি হয়। সুখদেও বলে, "এই এত গাছ চিনিস তোরা?"

এই সুখদেও নামে শহুরেটাকে তাদের বন-বস্তিতে এনে ফেলাটা সরিতার একেবারেই পছন্দ হয়নি। সে তাচ্ছিল্যের গলায় বলে, "আমাদের যা কাজে লাগে তা চিনি, ও তোকে নাম মুখস্থ বলতে পারব না। তুই সব রকম বন্দুক চিনিস নাকি?"

ওদের কথার মাঝেই অরণ্যের নিজস্ব শব্দভঙ্গ করে হঠাৎ পিছনে আওয়াজ করতে করতে দুটো বাইক ধুলো উড়িয়ে প্রায় গায়ের উপর এসে পড়ে। ওরা প্রায় লাফ দিয়ে পাশের দিকে সরে যায়, দেখে 'হ্যা হ্যা খ্যা খ্যা' করে হাসতে হাসতে লাল-কমলা চুলের তিনটে লোক কোমর বেঁকিয়ে চলে গেল।

সুখদেও বলে, "কী অসভ্য রে!"

সরিতা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়, "শয়তান হাতিগুলো, না এইগুলো, বুঝলি?"

কল কল করতে করতে ওরা দশতলা বাড়ির সমান আকাশে হাত-ছড়ানো এক ময়না গাছের তলায় এসে পড়ে। শাল-সেগুনের সঙ্গে চাপ, চিলৌনি, মাদার, টক আম, চালতা গাছ এই অরণ্যে প্রচুর। কিন্তু এমন দশাসই ময়না গাছ একটাই।

সরিতা বলে, "এই বুড়ি গাছ সবার উপরে উঠে চার পাশ দেখে রাখে। পাহারা দেয়।"

এ গাছের তলায় চার দিক থেকে বন পথ এসে মিশেছে। এখানে শেষ প্রবেশ

পথের গেট বন্ধ। পাশেই চৌকিদারের কাঠের বারান্দায় চেয়ারে বসে ভূপেন হাজোয়ারি জাবদা খাতায় কী সব এন্ট্রি করছে। সরিতা লাফিয়ে গিয়ে বিছানার তলা থেকে ট্রাঙ্ক বের করে সেখান থেকে

একটা চিপস আর চানাচুরের প্যাকেট নিয়ে আসে। ভূপেন আর ওর এটা এক ধরনের খেলা। ও জানে বাবা লুকিয়ে রাখবে ওরই জন্য, কিন্তু বাইরে নাটক করবে। আজ অবশ্য বাইরের বাইক ঢোকার খবরে ভূপেন ব্যস্ত হয়ে গেল।

সরিতা বলে, "আফা, কতগুলা বাইক ঢুকসে, দেখো নাই?"

দীপন ভ্রু কুঁচকে বলে, "আওয়াজ পাইসি। বাবুলাল কী করে? ফুন ঘুরায়?"

সুখদেও বিস্ময়ে বলে ওঠে, "বিস্কুটের প্যাকেট ট্রাঙ্কের মধ্যে?"

মুঞ্জু বলে, "আরে সব কিছু হাতি নিয়ে চলে যায়, না? ট্রাঙ্কও কোনও দিন চ্যাপ্টা করে দিয়ে যাবে।"

সরিতা ওদের কাছে এলে সুখদেও বলে, "তোর বাবা এই ঘরটায় বসে ডিউটি করে? চার পাশে কোনও দেওয়াল নেই, কাঁটাতার নেই, বাঘ ঢুকে পড়ে না?"

সরিতা এ বার বিরক্ত গলায় বলে, "ওরা আমাদের যত না বিরক্ত করে, আমরা বেশি করি। রাস্তার ও পাশে আর্মি ক্যাম্পের কাটা ব্লেডের জন্য আমাদের সলমান খান শুঁড়ে ঘা হয়ে মরে গেল।"

সুখদেও আবার অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, "সলমন খান হাতির নাম?"

লিয়ং কোমরে হাত রেখে এ বার জোরে হাসে। ওর হাসিতে ঝরা পাতার ফাঁকে লাফিয়ে বেড়ানো ছাতারের দল ছটফটিয়ে দূরে গিয়ে বসে। লিয়ং বলে, "আমাদের এখানে সলমন, শাহরুখ, রণবীর সব আছে। মারা যে গেল, সে সালমান, তার ইয়া মাসল ছিল!"

লিয়ংয়ের এই হাসি সরিতার পছন্দ হয় না। সে দুঃখী গলায় বলে, "ও ছিল সাত নম্বর কম্পার্টের হিরো। রেসিডেন্ট হাতি। মোটা আর অলস। মাঝে মাঝে আমাদের এক-এক বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াত। সবাই খেতে দিত। গ্রীষ্মকালে সব ঝোরা শুকিয়ে গেলে আমাদের টিউকলের সামনে এসে দাঁড়াবে। ব্যস, কেউ গিয়ে পাম্প করে দিলেই হল। এক দিন দুষ্টুমি করে আমার আর বিনসার গায়েও জল ছিটিয়েছে।"

সুখদেও বলে, "হেবি বদমাশ তো। তোরা কাছে যাস বুনো হাতির? দেখলি না, ওই বাগানে পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময় কেমন মেরে দিল?"

মুঞ্জু দোনামনা করে। হাতি ওদের ঘর ভাঙে, ফসল খায়। তবে রেঞ্জারকাকু সে দিন মিটিংয়ে বলেছেন, ওদেরও দোষ অনেক। হাতির নাকের ডগায় ভুট্টা আর কলা গাছ লাগায়। হাতি চলে গেলে এই বনে নাকি নতুন করে গাছ হবে না। বিটকাকু কত কী বোঝায়, হাতি পা দিয়ে

সরিতা ওদের কাছে এলে সুখদেও বলে, "তোর বাবা এই ঘরটায় বসে ডিউটি করে? চার পাশে কোনও দেওয়াল নেই, কাঁটাতার নেই, বাঘ ঢুকে পড়ে না?" সরিতা এ বার বিরক্ত গলায় বলে, "ওরা আমাদের যত না বিরক্ত করে, আমরা বেশি করি। রাস্তার ও পাশে আর্মি ক্যাম্পের কাটা ব্লেডের জন্য আমাদের সলমান খান শুঁড়ে ঘা হয়ে মরে গেল।"

মাটি তোলে, ঘাসের চামড়া সরে যায়। সেখানে বীজ পড়ে নতুন গাছ জন্মায়। এ ছাড়া আধ-খাওয়া ফল পটির সঙ্গে সঙ্গে দূরদূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু ওরাই বা করবে কী? ঠাকুরমার আমল থেকে এখানে আছে। যাবে কোথায়?

ওদের কথার মাঝে হরর টররর করে জোর আওয়াজ ওঠে। সুখদেও ভয় পেয়ে যায়। ওকে দেখে সকলে হেসে ওঠে।

সরিতা সুখদেওকে উদ্দেশ করে বলে, "এই যে বলিস তোদের ওখানে হাতি আর বাঘের ছড়াছড়ি, এই যাচ্ছে আর আসছে। আর তুই বাঁদর আর পাখির হুটোপাটি, কাঠবিড়ালির ডাক কিচ্ছু চিনিস না? ছ্যা ছ্যা!"

মুঞ্জু একটু বিব্রত হয়। কোনও মতে অনুরোধ করে সুখদেওকে বন-বস্তিতে এনেছে। এখানে বাইরের গাড়ি ঢুকতে দেয় না। রাতে নেমন্তন্নর প্রশ্নই নেই। হ্যাপি বার্থডে হল। কত ইচ্ছে ছিল সবাই মিলে শপিং মলে যাবে, পপকর্ন খাবে, কিন্তু সে দিন আবার কী একটা হইচই হল। ওদের বাবা-কাকারা ডিউটি থেকে ছুটি পেল না। সে সরিতাকে ঠেলা দিয়ে বলে, "থাম তো, তুই যেন সব জানিস? শেল রুটি বানাতে পারিস? কচু!" বলেই সুখদেওকে বলল, "চল চল, এর চেয়ে দেরি হলে বুড়ি ঠাকুরমা লাঠি হাতে রওনা দেবে।"

এ দিকে শীতের শেষ হয়েও হয় না, সেবক পাহাড়ের দিক থেকে ভেসে আসা ভেজা হাওয়া বসন্তকে থামিয়ে দেয়। এক বার শিরশিরানি উঠলেই আবার আরামের রোদ গায়ে হাত বুলিয়ে দেয়। বাতাস পাতার স্তূপে খচমচ শব্দ করে। পাতাগুলো শান-বাঁধানো পথে হাওয়ার ধাক্কায় সশব্দে এগোয়, কিন্তু এখানে তাদের পতন মৃদু ও মুহূর্তের। কেবল মানুষ ও ভারী জীবজন্তু তার উপর পা ফেললেই আওয়াজ জেগে ওঠে। গোটা পথটা ছায়া-আলোয় মাখা। উপরে তাকালে কোথাও খোলা আকাশ দেখা যায় না। বিনসার মনে হয় আকাশটা তার দোকানের চা-ছাঁকনির মতো, বড় বড় গাছের ডাল পাতার ভিতর দিয়ে কোনও মতে উঁকি মারে।

ডান দিকে বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে বেগুনি-রঙা জারুলের গাছ। বনবাবু বলেছিল, "নীচে বেশি বেশি জল থাকলে জারুল হয়। ওখানেই বোরিং করে নলকূপ বসাও।"

হাঁটতে হাঁটতে ওরা দেখল এই গাছগুলোর শেষে ওদের বস্তিতে ঢোকার মুখে যে নলকূপ, তার মুখ থেকে জল গড়াচ্ছে। চার পাশে পাতার স্তূপের মধ্যে সেই জল গড়িয়ে গেছে, কেউ খানিক আগেই চালিয়েছিল। এক দল ছাতারের কেউ মুখ ডুবিয়ে দিচ্ছে কলের মুখে, কেউ লেগে থাকা জল টানার চেষ্টা করছে, কেউ সেই জমা জলে পাখা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে স্নান করছে। মুঞ্জু, সরিতা, বিনসা, লিয়ংয়ের কাছে এ সব জলভাত। লিয়ং ফুর ফুর করে দৌড়ে গিয়ে পাখিগুলোকে ওড়াল। পাখিগুলো ওদের দিব্যি চেনে, একটু সরল বটে, কিন্তু বিশেষ আমল দিল না। শুকনো পাতায় লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে তারস্বরে ক্যাও ম্যাও করতে লাগল। ও দিকে মাথার উপরে আকাশ-ঢাকা গাছের ভিতর হাজার রকম পাখির রীতিমতো

ব্যান্ড পার্টি বসে গেছে।

সুখদেও বলে, "বাবা রে বাবা! সবাই বলে শহরে চিল্লানি। এ তো পুরোই ডিজে বক্স!"

সবাই হাসল। আর্মির বাড়ির ছেলে, চালাক-চতুর তো হবেই। একটা বাঁক ঘুরতেই ইয়া মোটা শিমুলকে পাশে রেখে সরু সিমেন্ট-বাঁধানো রাস্তা ঝপ করে নীচের দিকে নেমে গেছে। সুখদেও অবাক হয়ে দেখল, এত ক্ষণের গভীর জঙ্গল, যাকে মনে হচ্ছিল কখনও শেষ হবে না, আচমকাই শেষ হয়ে গেল। সামনে ঢালের গা থেকে নেমে গাছপালা ঘেরা বস্তি আর তার সামনে এ পাশ থেকে ও পাশ দেখা যায় না এমন নদী-চর। জঙ্গলটা যেন নদীর ভরসায় দাঁড়িয়ে। পিছনে অরণ্য, সামনে দীর্ঘ বিস্তারিত নদীর নানা শাখা। পাহাড়ি নদী বর্ষায় শুধু বিধ্বংসী। এখন কোথাও মোটামুটি জল, কোথাও নদীতলের সাদা পাথর রোদে দাঁত বের করে মুখ ভ্যাংচাচ্ছে। খাদের ধারে ঝুলে আছে দু'টি গ্রাম— হরটং আর লক্ষ্মীপুর ।

সুখদেও বলে, "তোদের আলো জ্বলে কী করে রে? ইলেকট্রিক পোস্ট নেই তো?"

লিয়ং বলে, "সোলারে চলে। ভোটের আগে শুনলাম ইলেকট্রিক দেবে। লরি বোঝাই সিমেন্টের খাম্বা এল। কিন্তু তার পর ফরেস্টের সঙ্গে গোলমাল লেগে গেল।"

মুঞ্জুর বাবা মোমো-চাউমিন-রোল বিক্রি করে। গ্রামের এক মাত্র প্রাইমারি স্কুল লাগোয়া তাঁর দোকান। ওদের পাকা ন্যাড়া ছাদের উপরে গোল ডিশ অ্যান্টেনা। কটকটে সবুজ রঙের ঘরে সাদা নেটের পর্দা। ওরা ঢুকতেই মুঞ্জুর ঠাকুরমা শান্তিমায়া লাল লাল ঝাল নেপালি আলুর দম আর রুটি খেতে দেয়। গজ গজ করতে করতে বলে, "গ্রামসুদ্ধ ভাত খায়। ওর চাই রুটি।"

ঠাকুরমা শান্তিমায়া প্লাস্টিকের থালায় ভাত বাড়ে, তাতে নদী চরের করকরে ধুলো বাতাসে ভর দিয়ে এসে মেশে। শিমের তরকারি, এক রকম আচার, কালো কলাই ডাল, মুলো দিয়ে রাঁধা ছানার তরকারি ভারী তৃপ্তি করে খায় সুখদেও। খেয়ে-দেয়ে আর তর সয় না। লিয়ং-কে ডেকে নেয়। সরিতা আর সঙ্গে বিনসা আসে। নদীর ধারে মোষের পিঠের মতো চওড়া একটা পাথরে গিয়ে বসে ওরা।

সুখদেও নদীর জলে পা ডোবায়। জল কম হলেও স্রোত আছে বেশ। কুচি কুচি ঢেউ তুলে শীর্ণ ধবধবে সাদা জলধারা এগিয়ে চলেছে।

মুঞ্জু বলে, "ওই উপরে কালিঝোরায় বাঁধ দেওয়ার আগে সারা বছর জলের কী ধার ছিল! এ সব পাথর ছিল জলের অনেক নীচে। মাঝে মাঝে যে দ্বীপ আর জঙ্গল দেখছিস, ও সব জল শুকিয়ে যাওয়ার পর হয়েছে। আমি অবশ্য ও সব জানি না। ঠাকুরমা বলে, তখন নাকি দেখার মতো ছিল নদী।"

বিনসা নদীর জলে পাথর ছুড়লে ছিটকে ওদের গায়ে জল লাগছিল। এর মধ্যে সরিতা লাফ দিয়ে নেমে ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। নদীর ধারা জালের মতো ভাগ হয়েছে। তেমনি এক ধারার পারে মাটির উপরে শ'খানেক হলুদ-কালো প্রজাপতি। প্রকৃতির কিছু দৃশ্য এমন শাশ্বত সুন্দর যে, ছটফটে বালক-বালিকার মনও তাতে আকর্ষিত হয়।

লিয়ং বলে, "ওরা নুন চাটতে এসেছে। সব জন্তু-জানোয়ারই নুন খায়। খালি আমার বাবার নাকি বারণ!"

হঠাৎ চার পাশ পায়ের তলা কাঁপিয়ে গুম গুম শব্দ উঠল।

সুখদেও "ভূমিকম্প! ভূমিকম্প!" বলে উঠল । ওরা দ্রুত তাকে টান মেরে নিয়ে পাথরের চাটানের পিছনে গুটিসুটি মেরে লুকিয়ে পড়ল।

আবার, আবার আওয়াজ। এ বার সুখদেওর মুখ-চোখ খরগোশের মতো সতর্ক ও উজ্জ্বল।

বলে, "ওহ, নদীর চড়ায় ফায়ারিং স্কোয়াড আছে! তা-ই বল!"

সরিতা বেজার মুখে বলল, "তোদের আর্মি এসে এই চরের দ্বীপগুলোয় ঢুকেছে। গোলাগুলির মধ্যে আমরা মাছ ধরতে যেতে পারি না, খেলতে পারি না।"

এ বারে সুখদেও রাগী গলায় বলে, "তোদের ওই পেয়ারের হাতিগুলোর মতো আর্মি নিরীহ স্কুলছাত্রকে আছড়ে মারে না। দেশ বাঁচায়, বুঝলি? ওদের ক্যাম্প মানে তোরা সবাই সুরক্ষিত।"

পাথরের পিছনে পা ছড়িয়ে বসে বিরক্ত মুখে সরিতা আর বিনসা ঘাসের নরম ডগা চিবোয়। গুলি-গোলা থামে। সন্ধে নেমে আসে বন-বস্তির জোড়াতালি দেওয়া ঘরবাড়ির মাথায়। সোলার প্যানেলগুলোয় দিনের শেষ আলো স্ফটিকের মতো ঠিকরোয়। দূর থেকে বিনসা, লিয়ংয়ের বাবা-মা'র উদ্বিগ্ন স্বর শোনা যায়। মুঞ্জুর বুড়ি ঠাকুরমা খনখনে গলায় চেঁচিয়ে ডাকেন। ইচ্ছে থাকলেও ওদের আর আড্ডা-খেলা জমে না।

সোলার আলোর তেমন ধার নেই। রাতে এখানে সবাই তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ে। মাঝ রাতে যেন ঘুমের মধ্যে চেঁচামেচির আওয়াজ পায় সুখদেও। ওদের এই বয়সে ঘুম খুব গাঢ় ও অনুদ্বিগ্ন থাকে। ঘুমের মধ্যে সুখদেও স্বপ্ন দেখে, জানলা দিয়ে হাতি শুঁড় ঢুকিয়ে সার দিয়ে রাখা ওদের টিফিন বাক্সগুলো তুলে নিয়ে যাচ্ছে। হাত-পা ছুড়ে বাধা দিতে থাকে আর তখনই একটা জোরালো ধাক্কায় ঘুম ভেঙে যায় তার।

চোখ কুঁচকে দেখে, ঘরের ভিতর কটকটে রোদ। ওর সামনে তিন বন্ধু বসে, দাঁড়িয়ে আছে।

লিয়ং বলে, "রেডি হয়ে নে। তাড়াতাড়ি তোকে ভাইয়া জঙ্গলের বাইরে দিয়ে আসবে। হেবি ঝামেলা লেগেছে।"

সুখদেও ভ্যাবলা চোখে ওদের দিকে তাকায়। মুঞ্জু পাশে বসে দুঃখিত স্বরে বলে, "কাল ওই চরে দু'জন মারা পড়েছে। এক জনকে বাইকে দেখেছিলি না? চান্দু নাম।"

সরিতা দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। বলে, "বেশ হয়েছে মরেছে। হরিণ মেরে বিক্রি করত। ওই চরে ঢুকেছিল জীবজন্তু মারতে। সঙ্গের আর-একটা নাকি কার্তুজে পা দিয়ে মরেছে।"

লিয়ং বলে, "আরও খারাপ হয়েছে রে। ওখানে হাতিও ছিল। বডি পাওয়া গেছে একটার।"

হঠাৎ করে এত মৃত্যু, হত্যার খবরে হতভম্ব হয়ে যায় সুখদেও। তার পর লাফিয়ে নামে। দ্রুত জামাকাপড় নিয়ে মুঞ্জুর ইশারায় পাশে পর্দা-ঢাকা রান্নাঘরে ঢোকে। বাবা শহরে নেই বলে মা'র কাছে অনুমতি পেয়ে এসেছে। বেশি ঝামেলা হলে, বাবা ঠিক খবর পেয়ে যাবে। চটপট বাইরের জামা-প্যান্ট পরে আসে। বলে, "বিনসাকে দেখছি না?"

সরিতা বলে, “ওদের আত্মীয় এক জন মারা গেছে। ওরা সবাই গেছে সেখানে। তবে চলে আসবে এক ফাঁকে। চান্দুকাকাকে কেউ পছন্দ করে না। আমাদের এলাকার নাম খারাপ করে দিয়েছে।”

ওরা চার জন ঢালের উপরে উঠে জঙ্গলের পথ ধরে। সুখদেওর ভারী বিমর্ষ লাগে। আর্মি নিশানা তো অভ্যেস করবেই। সেখানে মানুষ না থাক, জীবজন্তু তো থাকবে। গুলি চললে মরবেই, কেউ না কেউ।

খানিকটা এগোতেই ওরা বিনসাকে দেখতে পায়। সঙ্গে আর-একটা ছেলে। চাপা উত্তেজনা ওদের চোখে-মুখে। সবাই দৌড়ে ওদের সঙ্গ ধরে।

সরিতা ছেলেটিকে উদ্দেশ করে বলে, “ভাদু, চান্দুকাকার সঙ্গে বাইরের যে লোকটা ছিল, তার লাশ পেল?”

বিনসা ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলে, “তাড়াতাড়ি চল। চার নম্বর কম্পার্টে হাতির দলটা ঢুকেছে। গুলি-খাওয়া দুটো হাতি আছে মনে হল। আগে সামনে থেকে দেখতে হবে,তার পর সরিতার বাবাকে খবর দিবি,” সুখদেওর দিকে চোখ পড়তেই বিরক্তি সহকারে বলে, “এটাকে তোরা সঙ্গে নিলি কেন? ভাইয়ার সাইকেলে যাওয়ার কথা ছিল না?”

মুঞ্জু তড়িঘড়ি বলে, “ওকেই এগোতে যাচ্ছি। ভাইয়াকে না পাই, বাবুলালকাকা ওকে বাসে উঠিয়ে দেবে।”

সরিতা আজ নরম গলায় বলে, “সুখদেও, তুই আবার এক দিন আসিস। তবে আমাদের এখানে এমন চলতেই থাকে রে। মুঞ্জুর মাকে বাঘে থাবা দিয়েছিল।”

গভীর বেদনার চোখে মুঞ্জুর দিকে তাকায় সুখদেও। মুঞ্জু নদীর দিকে দৃষ্টি ফেরায়। সুখদেও ইতস্তত করে বলে, “আমিও যাব তোদের সঙ্গে।”

তিন জনে অবাক হয়ে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বলে, “এই বন-জঙ্গলে তুই ঢুকবি? তাও হাতি বাঁচাতে?”

সুখদেও মাস্‌ল ফোলায়। বলে, “আমার বাবা আর্মিতে মালির কাজ করে। বড় বড় মেলায় কত ফুলের টব নিয়ে যায় আর এত বড় বড় প্রাইজ় পায়। আমিও আর্মিতে যাব। অনেক ট্রেনিং জানি। অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসে কত কিছু করতে হয়। আর্মিতে সবাই সব সময় শুধু গুলি ছোড়ে না। বড় বড় বিপদে ওরা সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ে। চল, আর দেরি নয়, রোদ বাড়লে ঘায়ের ভিতরে ওই সিসা জ্বালিয়ে মারবে। তাড়াতাড়ি গুলি বের করে দিতে হবে,” বলেই পাশের একটা গাছে লাফ দিয়ে উঠে পিঠের ব্যাগটা ঝোলায় উপরে।

নেমে এসে বলে, “মুঞ্জু, তোর বদলে আমি যাচ্ছি। তুই ঠাকুরমাকে সাহায্য কর। আমি তো আজ আর বাড়ি ফিরছি না। এসেই পেট পুরে খাব। রাই শাক আর ভাত। সবাই মিলে যাওয়ার দরকার নেই। লিয়ংয়ের ফোন আছে। তোকে কল করব। তুই সবাইকে জানিয়ে দিবি।”

মুঞ্জু হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। অবশেষে তার বনের বন্ধুদের সঙ্গে শহরের বন্ধুর ভাব হচ্ছে। বদলে ঠাকুরমার চালের কাঁকর বেছে দিতে হলেও আপত্তি নেই। সে সম্মত হয়ে হাত নাড়ে। লিয়ং, সরিতা, বিনসা, আর ভাদু দ্রুত অরণ্যপথে মিশে যায়।

ছবি: মহেশ্বর মণ্ডল

গল্প পাঠানোর নিয়মাবলি

- আনন্দমেলায় গল্প পাঠাতে হবে ডাকে কিংবা ইমেলে। পত্রিকা দফতরের রিসেপশনে এসেও গল্প জমা দিতে পারেন।
- ডাকে কিংবা দফতরে জমা দিলে গল্পটি হাতে লিখে কিংবা কম্পিউটারে কম্পোজ় করে প্রিন্ট আউট নিয়েও পাঠাতে পারেন। তবে লেখাটি মনোনীত হলে তখন কিন্তু ইউনিকোডে কম্পোজ় করা সফ্‌ট কপি পাঠাতে হবে। ইমেলে পাঠালে কিন্তু গল্পটিকে প্রথমেই ইউনিকোডে কম্পোজ় করেই পাঠাতে হবে।
- গল্পের পাণ্ডুলিপির সঙ্গে নিজের নাম, ঠিকানা, মোবাইল/ ফোন নম্বর পাঠানো বাধ্যতামূলক।
- গল্পের শব্দসংখ্যা ২০০০-এর মধ্যে রাখাই ভাল।
- গল্পটি যেন মৌলিক হয়। অন্য কোনও গল্পের অনুবাদ কিংবা অনুসরণ কিংবা অনুকরণ হলেও চলবে না। এবং কোথাও যেন গল্পটি প্রকাশিত না হয়ে থাকে।
- ডাকযোগে গল্প পাঠানোর ঠিকানা: সম্পাদক, আনন্দমেলা, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০১।
- গল্প পাঠানোর ইমেল হল: anandamela@abpmail.com

দীপসুন্দর দিন্দা

আনন্দমেলার কুইজ় বিভাগের প্রশ্ন করছেন 'দাদাগিরি আনলিমিটেড সিজ়ন সিক্স'-এর বিজয়ী দীপসুন্দর দিন্দা।

10 মহাভারত অনুসারে বলরাম ও সুভদ্রার মায়ের নাম কী?

1 মাইকেল মধুসূদন দত্তকে নিয়ে লেখা জীবনীমূলক নাটক 'শ্রীমধুসূদন' কার লেখা?

মধুসূদন দত্ত

2 লুইস সুয়ারেজ় বললেই মনে পড়ে উরুগুয়ের সেই ফুটবলারের কথা। কিন্তু ওই নামে আরও এক ফুটবলার ছিলেন। তিনি কোন দেশের?

8 কোন বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করাকে বলা হয় অ্যাগ্রোস্টলোজি?

9 এটি বিজ্ঞানে নেদারল্যান্ডসের সর্বোচ্চ পুরস্কার, যাকে 'ডাচ নোবেল'-ও বলা হয়। কোন পুরস্কার?

3 মহাশিবরাত্রি উৎসবের জন্য বিখ্যাত উত্তরবঙ্গের জল্পেশ মন্দির কোন জেলায় অবস্থিত?

জল্পেশ মন্দির
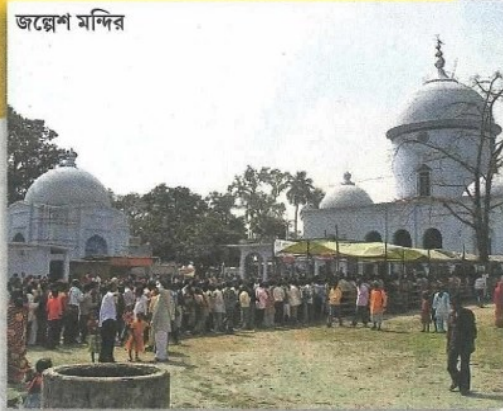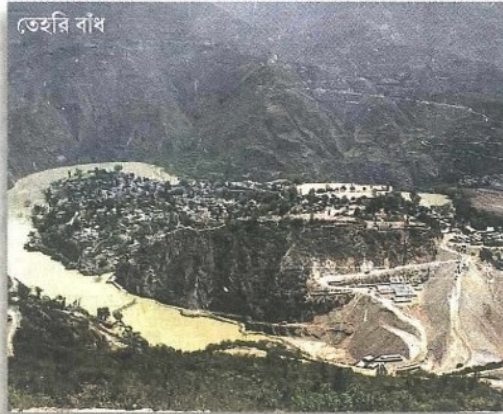
4 ভারতের কোন রাজ্যের কারাগারের নতুন নাম হল 'রিফর্ম হোমস'?

5 আবু আল-রাহান মহম্মদ ইবন আহমদ, বিখ্যাত এই পর্যটককে আমরা কোন নামে বেশি চিনি?

6 ভারতের বিখ্যাত তেহরি নদী বাঁধ কোন নদীর উপর অবস্থিত?

7 প্রথম ভারতীয় হিসেবে 'দ্য বেস্ট এশিয়ান আন্ডার-টোয়েন্টি মেল অ্যাথলেট অফ দ্য ইয়ার অ্যাওয়ার্ড', জিতলেন কে?

তেহরি বাঁধ

৫ জুলাই সংখ্যার উত্তর

১। সমরেশ বসু।
২। সুরিনাম।
৩। চেন্নাই।
৪। অজয়পাল সিংহ বাঙ্গা।
৫। ম্যাঞ্চেস্টার সিটি।
৬। দূরদর্শনে ইংরেজি ভাষায় সংবাদপাঠিকা।
৭। ৮ জুন।
৮। দ্বিতীয় পুলকেশী।
৯। সতীনাথ মুখোপাধ্যায়।
১০। বিষ্ণুপুর।

সঠিক উত্তরদাতা

প্রত্যুষ ঘোষ, *অষ্টম শ্রেণি, নয়াবসত পার্বতীময়ী শিক্ষানিকেতন, পশ্চিম মেদিনীপুর।*
বৈশালী পোদ্দার, *অষ্টম শ্রেণি, অগজ়িলিয়াম কনভেন্ট স্কুল, ব্যান্ডেল।*
বিতান পোদ্দার, *সপ্তম শ্রেণি, ডন বস্কো স্কুল, ব্যান্ডেল।*
রাজর্ষি সাহা, *ষষ্ঠ শ্রেণি, রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম রহড়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, উত্তর চব্বিশ পরগনা।*
সপ্তক ঘোষ, *ষষ্ঠ শ্রেণি, বোলপুর হাই স্কুল, বোলপুর, বীরভূম।*
সমন্বয় চক্রবর্তী, *ষষ্ঠ শ্রেণি, বনগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়, বীরভূম।*

উত্তর পাঠাও ২৫ অগস্টের মধ্যে, anandamelamagazine@gmail.com এই ঠিকানায়।

নীল আগুন

কুবলয় বসু

মার্চ মাসের এক মাঝ রাত, ১৮৫৯ সাল

একটি কুঁড়েঘরের সামনে কুড়ি-তিরিশ জন লোক জড়ো হয়েছে। খুব মৃদু স্বরে কথাবার্তা চলছে। টিম টিম করে একটি কুপি জ্বলছে। সবার মাঝখানে বসে আছেন এক জন বয়স্ক মানুষ, তাঁর পাশে আরও দু'জন বসে। এই তিন জনকে দেখলেই বোঝা যায় বেশ মান্যিগন্যি করার মতো কেউ। এঁদের কথাই বাকিরা শুনছিল। বয়স্ক মানুষটি বলছিলেন, "রানাঘাট, সাধুহাটি, চণ্ডীপুর এই সব জায়গার জমিদারদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়েছে। ওঁরা আমাদের সঙ্গে আছেন। এ বার হাতে অস্ত্র তুলতেই হবে। আরও লোক জোগাড় করো। না হলে আমাদের কারও নিস্তার নেই।"

পাশে বসা দু'জনের এক জন বলে উঠলেন, "যত অর্থ লাগে, আমরা দেব। কিন্তু এ বার নিজেদের হাতে রাশ নিতেই হবে। আইন আমাদের সঙ্গে নেই। তিন

বছর আগে সাহেবরা এমন আইন পাশ করিয়েছে যে, আমরা আদালতে মামলা করলেও বিচারকদের পাশে বসে নীলকর সাহেবরা নিজেদের দিকে মামলা ঘুরিয়ে নেবে। অনেক অত্যাচার দেখেছি, আর নয়। নীলকুঠির দেওয়ানি পদে ইস্তফা দিয়ে এসেছি। এ বার ওদের মারব। সকলে লাঠি ধরো। বরিশাল থেকে আরও লেঠেল আমি আনাব। গোবিন্দপুরে আজ যে কাজ দিয়ে আমাদের শুরু করার কথা, আমরা একটু পরেই যাব সে কাজে।"

বয়স্ক মানুষটি পাশে বসা মানুষটিকে বললেন, "শোনো দিগম্বর, আমার বয়স হয়েছে, তবু আমি সর্বতোভাবে তোমাদের পাশে আছি। তোমাদের দু'জনের উপর এ কাজের ভার রইল। জোর করে নীল চাষ করানো বন্ধ করতেই হবে।"

এমন সময় একটু দূরে কুঁড়েঘরের পিছন দিকটায় শুকনো পাতার খড়মড় শব্দে সবাই সচকিত হয়ে উঠল। দু'জন ছুটে গেল সেই দিকে। নীলকর সাহেবদের কোনও গুপ্তচর নয় তো! যে দু'জন ছুটে গেছিল, তারা সঙ্গে করে নিয়ে এল একটি বাচ্চা ছেলেকে, বড় জোর বছর বারো বয়স। তার দিকে বয়স্ক মানুষটি খানিক ক্ষণ তাকিয়ে রইলেন, তার পর তাঁর মুখে ফুটে উঠল মৃদু হাসি। তিনি হাত বাড়িয়ে ডাকলেন, "এসো দাদুভাই, এসো। তোমাকে দিয়েই শুরু করা যাক আজকের শুভ কাজ।"

মার্চ মাসের একটি দিন, ২০২৩ সাল

এই প্রথম বার মামাবাড়ি যাচ্ছে বিজন। তার বাবা চাকরি সূত্রে বাংলার বাইরে বাইরেই এত দিন কাটিয়েছেন। মাঝে মাঝে তারা কলকাতায় এলেও মামাবাড়ি কখনও যাওয়া হয়নি। এ বার বাবা বদলি হয়ে পাকাপাকি ভাবে কলকাতায় চলে এসেছেন। আরও আগেই আসার কথা ছিল, কোভিডের কারণে তাঁর বদলি আটকে ছিল। কলকাতায় আসার পরে হাতে আরও পাঁচ দিন ফাঁকা আছে বাবার। তাই তিন দিনের জন্য মামাবাড়ি যাওয়া হচ্ছে। মা দীর্ঘ দিন তাঁর নিজের বাড়ি যাননি। বিজন জ্ঞানত তার দাদুকে ফটো বা ভিডিয়ো কলে ছাড়া সাক্ষাতে কখনও দেখেনি। তাই তার ভিতরেও একটা উত্তেজনা কাজ করছে। দিদা তার জন্মের আগেই মারা গেছেন। এ ছাড়া আছেন মামা। তিনি বিয়ে-থা করেননি।

শিয়ালদা থেকে ট্রেন ধরে দু'ঘণ্টারও বেশি পথ পেরিয়ে বগুলা স্টেশনে নামতে হয় মামাবাড়ি যেতে গেলে। বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ বিজন বাবা-মা'র সঙ্গে মামাবাড়ি পৌঁছোলে একটা সাড়া পড়ে গেল। এই প্রথম বার নাতিকে সামনে পেয়ে বিজনের দাদু আনন্দে আত্মহারা। মামাও
খুব খুশি। বিজনের মুখেভাতের পর এত দিন বাদে আজ ফের বিজনকে সামনে পেলেন তাঁরা। স্নান-খাওয়া সেরে একটু গড়িয়ে নিলেন সবাই। সন্ধেয় দাদুর ঘরে গিয়ে বসা হল। মা তো সকাল থেকেই আবেগে কেঁদে ফেলছিলেন, এত দিন বাদে নিজের বাবা আর ভাইকে দেখে। এখনও তার ব্যতিক্রম হল না। খানিক পরে বাবা আর মামা দোকান-বাজারে বেরোলেন আর মা গেলেন দাদুকে দেখভালের দায়িত্বে থাকা মিনতিমাসির সঙ্গে, রাতের রান্নার ব্যবস্থা করতে। এত দিন বাদে সবাইকে পেয়ে নিজের হাতে দু'-এক পদ রেঁধে খাওয়ানোর খুব ইচ্ছে বিজনের মায়ের।

বিজন বসে রইল দাদুর কাছেই। বিরাট বড় ঘর, উঁচু পালঙ্কের এক ধারে দাদুর পাশে বসেছিল সে। দেওয়ালে চার দিকে বিভিন্ন মানুষের ফ্রেমে বাঁধানো ছবি টাঙানো রয়েছে। কোনওটা ফটোগ্রাফ, আবার কোনওটা আঁকা ছবি। সবই বেশ পুরনো। ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বিজন সেগুলোর দিকে দেখছিল দেখে দাদু বললেন, "সবাই কিন্তু তোমার পূর্বপুরুষ। আমাদের বংশের এই এলাকায় খুব সুনাম আছে। আগে জমিদার পরিবার ছিলাম আমরা। যাঁদের ছবি দেখছ, তাঁদের মধ্যে অনেকে কিন্তু ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়েওছিলেন।"

বিজন অবাক হয়ে ভাবছিল, এত গল্পের কিছুই প্রায় সে জানে না। মা তেমন কিছুই বলেননি সে ভাবে। দাদু বলছিলেন, "আমার জন্ম তো পরাধীন ভারতেই। ভারতবর্ষ যে দিন স্বাধীন হয়, বাবার হাত ধরে গিয়েছিলাম পাশের ওই মাঠে। জড়ো হয়েছিল গ্রামের সবাই। সে ভারী আনন্দের দিন ছিল। তবে, খুব ছোট ছিলাম তো, সবটা ভাল করে আর মনেও নেই," বলে দাদু তাঁর মাথার ঠিক পিছন দিকেই একটা বাঁধানো ছবির দিকে দেখিয়ে বললেন, "এই হচ্ছেন আমার বাবা, সুধন্য তালুকদার।"

বিজন ছবির দিকে তাকিয়ে দেখল, অনেকখানিই তার দাদুর মুখের আদল, এমনকি তার মা'র মুখের সঙ্গেও খুব মিল। এই সময় হাত মুছতে মুছতে মা এসে ঢুকলেন ঘরে। বিজনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "কী বলা হচ্ছে দাদুকে?"

বিজন মাকে অনুযোগের সুরে বলল, "দাদু পুরনো দিনের কত গল্প বলছিল। তুমি তো কিছুই বলোনি আমাকে এ সব!"

মা হেসে বললেন, "আমিই কি সবটা জানি! এখন দাদুর থেকে সে সব শুনে নিস।"

এমন সময় বাবা আর মামা-ও দোকান-বাজার সেরে ঘরে এসে ঢুকলেন। মা বললেন, "সবাই যখন এসে গেছে, খাওয়াদাওয়া সেরে নেওয়া যাক। বাবার তো সাড়ে আটটায় খেয়ে নেওয়া অভ্যেস। এখন তো প্রায় ন'টা বাজতে যায়। খাওয়া সেরে আমরা না হয় পাশের ঘরে গিয়ে গল্প করব। বাবা এ ঘরে বিশ্রাম নিক খেয়ে।"

বিজন কী যেন ভাবছিল। মা'র কথা শেষ হতেই সে বলে উঠল, "আমি আজ এ ঘরেই দাদুর সঙ্গে শোব।"

মা চোখ পাকিয়ে বললেন, "দাদুকে রাত জাগিয়ে বিরক্ত করার কোনও দরকার নেই। তুমি আমাদের সঙ্গেই শোবে।"

বিজনের দিকে তাকিয়ে দাদু বললেন, "আহা, থাক না। এখানেই শুয়ে পড়ুক। এত বড় খাটে দিব্যি হয়ে যাবে। আজ সবাই ক্লান্ত তোরা, ও ঠিক ঘুমিয়ে পড়বে। আর, আমিও তো ওষুধ খেয়েই ঘুমোই। দাদুভাই আমাকে জাগিয়ে রাখতে চাইলেও পারবে না।"

বিজনের এই ঘরটা খুব পছন্দ হয়ে গিয়েছিল। তাই সে পুরো ঘাড় হেলিয়ে ভাল ছেলের মতো মাকে বুঝিয়ে দিল যে, সে কক্ষনও দাদুকে রাত জাগিয়ে বিরক্ত করবে না। দাদু আর মামা তাই দেখে হা হা করে হেসে উঠলেন।

মাঝ রাত

সারা বাড়ি নিস্তব্ধ। যে যার ঘরে ঘুমন্ত। দাদুর পাশে শুয়ে বিজন অনেক ক্ষণ এ পাশ ও পাশ করছিল। দুপুরে বেশ খানিকটা ঘুমিয়েছে, তাই সহজে ঘুম আসছিল না। তার পর কখন যেন চোখ লেগে গিয়েছিল। শিয়ালের ডাকে ঘুম ভেঙে গেল তার। এখানে এখনও শিয়াল আছে! চোখ খুলে অন্ধকারে একটু চোখ সয়ে যেতেই দেখল পাশে দাদু গভীর ঘুমে। মেঝেয় মিনতিমাসি বিছানা করে ঘুমোচ্ছে। খাট থেকে আস্তে আস্তে নেমে এসে সে জানলার ধারে দাঁড়াল। শিয়ালের ডাক কিছু ক্ষণ অন্তর অন্তরই শোনা যাচ্ছে। খুব কাছেই মনে হচ্ছে। জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল সে। বেশ খানিকটা দূরে একটা

আলো টিম টিম করছে। গাছপালার ফাঁক দিয়ে অল্প কিছু বাড়িঘর দেখা যাচ্ছে ছায়ার মতো। কুঁড়েঘর মনে হচ্ছে না? সকালে তো আশপাশে সে রকম কিছু চোখে পড়েনি। বরং পাশের মাঠ পেরিয়ে অনেক পাকা বাড়ি দেখেছিল সে। সে সব কোথায় গেল! কাল সকালে দাদুকে জিজ্ঞেস করতে হবে। তবু তার বেশ কৌতূহল
হচ্ছিল এখন।

ঘরের ভেজানো দরজা খুলে বাইরের দালানে এল বিজন। পায়ে পায়ে সদর দরজার কাছে এসে দেখল সেটাও খোলা, শুধু ভেজানো রয়েছে। কিসের যেন অদ্ভুত একটা টানে দরজা খুলে সে বেরিয়ে পড়ল। দূরে চোখে পড়া আলো লক্ষ করে এগোতে থাকল সে। সকালে দেখা এই জায়গাটা আর এখন চার দিকে যা কিছু চোখে পড়ছে, কিছুতেই মেলাতে পারা যাচ্ছে না। ক্রমে দূরের আলোটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে। গলার স্বরের একটা গুঞ্জন কানে আসছিল তার। শব্দ আর আলোর উৎস লক্ষ করতে করতে একটা কুঁড়েঘরের পিছন দিকে গিয়ে দাঁড়াল সে। তার পায়ের নীচে শুকনো পাতার খড়মড় শব্দে কারা যেন ছুটে এল এ দিকে। আর তার পর...

১৮৫৯ সালের মার্চ মাসের সেই মাঝ রাত

বয়স্ক মানুষটি সকলের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমার দাদুভাই আজ আচমকা এখানে চলে এসেছে। এখানে ও একেবারেই নতুন। তবু আমার বংশধর যখন, ও-ও আমাদের সঙ্গে আজকের কাজে যোগ দেবে। গোবিন্দপুরে নীলকররা গ্রাম আক্রমণ করে প্রজাদের সর্বস্ব কেড়ে নিয়েছে। আমার বন্ধু, জমিদার রাখাল তালুকদারকে পরিবার সহ তুলে নিয়ে গিয়ে গুম করে রেখেছে। হয়তো রাখালকে মেরেও ফেলেছে। সেই শোধ তোলার শুরু হোক আজ থেকে। দাদুভাই দেখুক, জানুক যে, কী ভাবে লড়াই করে আমরা ওকে এনে দিতে পেরেছি মুক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস নেওয়ার দিন।"

সবাই মিলে এগিয়ে চলল গোবিন্দপুরের দিকে। ছেলেটি অবাক হয়ে বয়স্ক মানুষটির দিকে তাকিয়ে রইল। এঁকে যে দেখতে অনেকটা... নাহ, তার মাথায় কিছু ঢুকছে না।

গ্রামে ঢোকার মুখ থেকেই আস্তে আস্তে চার দিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল সবাই, যাতে গোটা গ্রাম ঘিরে ফেলা যায়। পুরো গ্রাম এমনিতেই থমথমে, তার উপর রাতের বেলা আরওই স্তব্ধ হয়ে আছে চার পাশ। শোনা গেছে, রাখাল তালুকদারের বাড়ি দখল করে সেখানেই নীল কুঠির লোকজন সব পাহারা দিয়ে রয়েছে, গ্রামের বাকিরা যাতে নীল চাষে আর আপত্তি করতে না পারে। গ্রামের লোকজনের কাছ থেকেই গোপনে এই খবর মিলেছে। সেই বাড়িতে আজ আগুন লাগিয়ে, নীল কুঠির যারা যারা আছে, সব ক'টাকে উচিত শিক্ষা দিতে হবে।

রাখাল তালুকদারের বাড়ি ঘিরে ফেলা হল। হাতে হাতে জ্বলে উঠল মশাল। বয়স্ক মানুষটি পাশে দাঁড়ানো ব্যক্তিটির দিকে তাকিয়ে বললেন, "বিষ্ণু, আমার দাদুভাই-ই আগুন লাগাবে প্রথম। ওর হাত দিয়েই শুরু হোক নীল অত্যাচারের নিধন যজ্ঞ। নীলের আগুন ছড়িয়ে পড়ুক সর্বত্র।"

বছর বারোর সেই ছেলেটির হাতে তুলে দেওয়া হল মশাল। বয়স্ক মানুষটি চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, "মোরা আর নীল করব না।"

সকলে সমস্বরে গলা মেলাল। তার পর তিনি ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বললেন, "কই দাদুভাই, লাগিয়ে দাও খড়ের চালে আগুন। জব্দ হোক অত্যাচারী নরকের কীটগুলো," বলে নিজেই তার হাত নিজের হাতে টেনে নিয়ে আগুন লাগিয়ে দিলেন। ঘরের ভিতরে তখন হুলস্থুল পড়ে গিয়েছে, সকলে বাইরে বেরোনোর জন্য ছটফট করছে। কিন্তু ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা লেঠেল বাহিনী দরজা আগলে রয়েছে। দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল ঘর।

ছেলেটি আচমকা আর্তনাদ করে উঠল। আগুন লাগাতে গিয়ে তার হাতেও লেগে গেছে আগুনের ছ্যাঁকা। বয়স্ক মানুষটি গম্ভীর স্বরে বললেন, "দিগম্বর, তুমি দাদুভাইকে নিয়ে যাও। হাতে আগে ঠান্ডা জল দাও, তার পর ওকে ঘরে রেখে এসো। সব তো জানোই। আজ যে মহৎ কাজ শুরু হল, এ কথা ইতিহাসে লেখা থাকবে চির কাল।"

পর দিন সকাল, মার্চ মাস, ২০২৩ সাল

বিজনের ঘুম ভাঙতে বেশ দেরি হল। ঘুম ভেঙে উঠেই সে খানিক ক্ষণ চুপ করে বসে রইল। আবছা আবছা কী-সব মনে পড়ছে। তার চোখ গেল দেওয়ালে টাঙানো ছবিগুলোর দিকে। নির্দিষ্ট একটা ছবির দিকে তাকিয়ে তার চোখ আটকে গেল। এই তো সেই মানুষটি! মনে পড়ে গেল সব। ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখল দাদু জানলার পাশে ইজ়িচেয়ারে বসে বই পড়ছেন। তাকে ঘুম থেকে উঠতে দেখে কৌতূহলী হয়ে তাকালেন। বিজন দাদুকে ছবিটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, "উনি কে? কাল রাতে আমি ওঁকেই দেখেছি।"

তার পর বাকি ঘটনাগুলোও যতটা যা খেয়াল পড়ছিল, দাদুকে সে বলল। দাদু তার দিকে খানিক ক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, "বুঝেছি। তুমি যাঁকে দেখালে, তিনি আমাদের পূর্বপুরুষ, জমিদার গোপাল তালুকদার। কৃষকদের জোর করে নীল চাষ করানোর বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল, তার অন্যতম যোদ্ধা ছিলেন তিনি। বয়সের কারণে আন্দোলনে সব সময় তিনি নিজে না-থাকতে পারলেও, বিদ্রোহীদের পাশে সব সময় ছিলেন। তাঁর সঙ্গী ছিলেন তাঁর দুই কাছের মানুষ, বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস এবং দিগম্বর বিশ্বাস। ইতিহাসের বইয়ে নীল বিদ্রোহের নেতা হিসেবে যাঁদের নাম তুমি পাবেই।"

বিজন অবাক হয়ে শুনছিল। দাদু বলছিলেন, "আমাদের পরিবার, এই গ্রাম এক সময় নীল বিদ্রোহে অংশ নিয়েছিল, নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। কাল রাতে তুমি যেটা দেখেছ, সেটাই বিদ্রোহের শুরু। ছোটবেলায় আমিও এক রাতে তোমার মতোই এই ঘটনার মধ্যে গিয়ে পড়েছিলাম, তোমার মামা-ও তাই। তবে তোমার মা এ সব দেখেছিল বলে শুনিনি কখনও। আমার বাবা-ও একই জিনিস দেখেছিলেন। জীবনে সব সময় ন্যায়ের পক্ষ নিতে হয়, অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে হয়, বংশ পরম্পরায় সেখান থেকেই শিখেছিলাম। আজ তুমিও জানলে।"

তত ক্ষণে ঘরে মা-বাবা-মামা সবাই এসে গেছিলেন। বিজন সবার দিকে এক বার তাকিয়ে নিয়ে বলল, "এ সব সত্যিই ঘটেছিল? আর, আমি কাল রাতে সে সবের মধ্যে চলে গেছিলাম!"

দাদু একটু হাসলেন, তার পর নিজের ডান হাতটা তুলে দেখালেন। তাঁর কব্জির কাছে কালচে একটা দাগ, পুড়ে যাওয়ার দাগ যেন। দেখল তার মামার হাতেও ঠিক একই রকম দাগ। আর, তখনই সে অনুভব করল যে, তারও ডান হাতের কব্জির কাছটা অল্প জ্বালা জ্বালা করছে। চোখের সামনে হাতটা তুলে অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখল, তারও কব্জির কাছে পোড়া একটা দাগ। এ দাগ এত দিন ছিল না। কাল রাতের পর এই দাগ পাকাপাকি ভাবে তার হাতে চলে এসেছে!

ছবি: তারকনাথ মুখোপাধ্যায়

অনেকের ছবি আঁকতে ভাল লাগে। অনেকের ভাল লাগে গল্প, কবিতা, ছড়া লিখতে। তোমাদের যা ইচ্ছে তা লিখে এবং এঁকে পাঠাও। ভাল হলে এই বিভাগে প্রকাশ করা হবে।

আমার ছবি
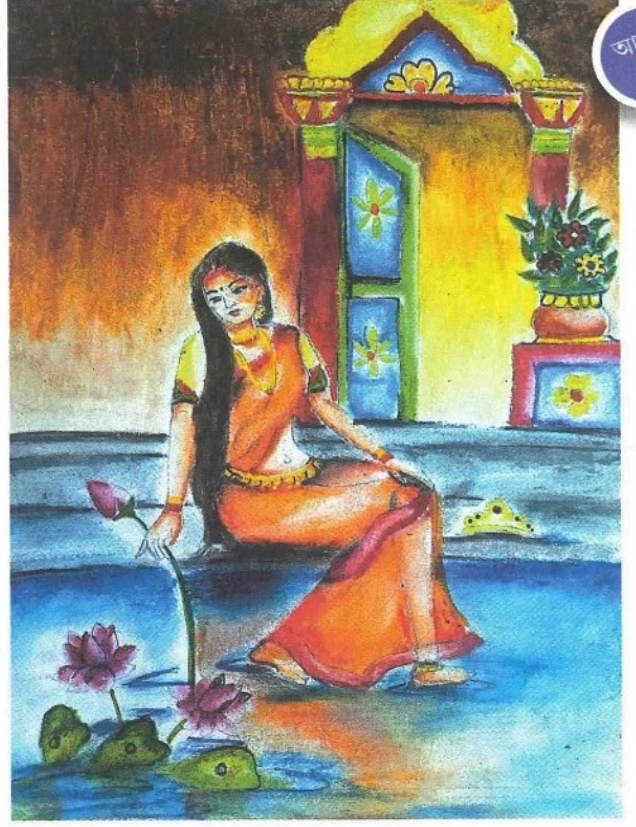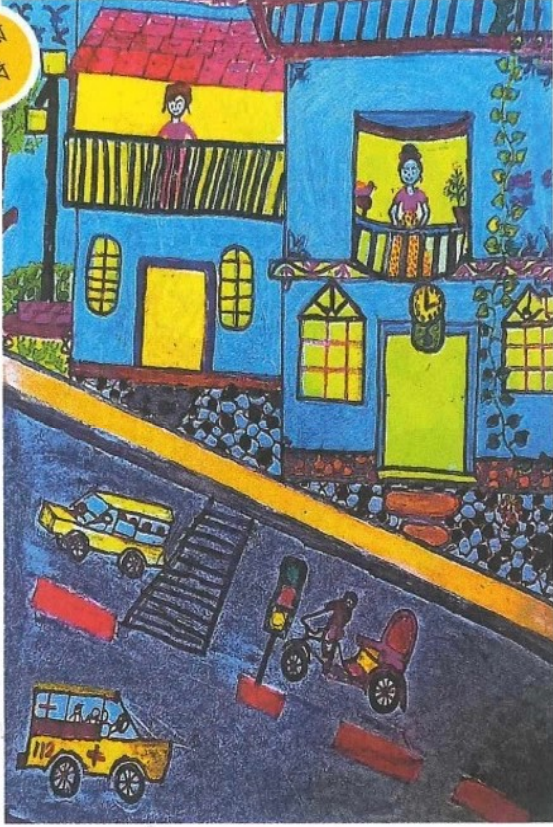
রোহিত মণ্ডল
চতুর্থ শ্রেণি, নাটাবেড়িয়া অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়, নাটাবেড়িয়া, বাগদা, উত্তর ২৪ পরগনা।

আমার ছবি

সুলিপি ঘোষ
অষ্টম শ্রেণি, তারকেশ্বর গার্লস হাই স্কুল, তারকেশ্বর, হুগলি।

আমার লেখা

পিপীলিকা

পিপীলিকা তুই কত ছোট রে,
তুই কত ছোট।
তুই করিস শীতের সঞ্চয়,
তাও আবার গরম কালে।
তুই শুধু লাল ও কালো রঙের হোস,
তোকে সবাই খারাপ বলে,
কারণ তুই সবাইকে কামড়াস,
কিন্তু পিপীলিকা এই স্বভাব
ভাল নয় রে তোর ভাল নয়।

বিশ্বজিতা সেনগুপ্ত
সপ্তম শ্রেণি, কমলা গার্লস হাই স্কুল, কলকাতা।

আমার ছবি
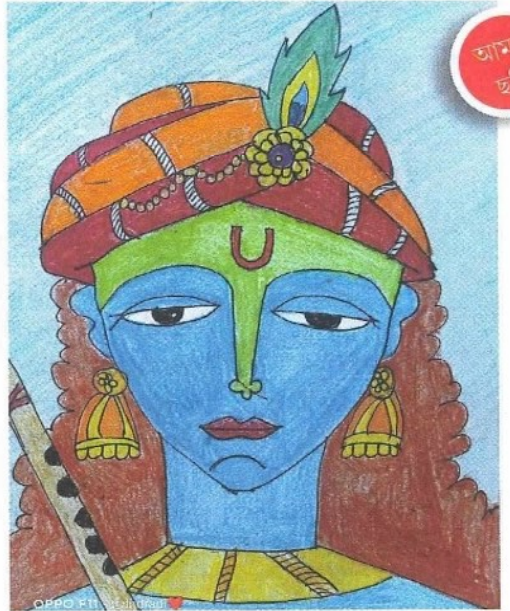
অনিরুদ্ধ সরকার
ষষ্ঠ শ্রেণি, দিল্লি পাবলিক স্কুল, বর্ধমান।

তোমরা যারা দ্বিতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ো, তারা এই পাতার জন্য লেখা এবং ছবি পাঠাও, anandamelamagazine@gmail.com ঠিকানায়।
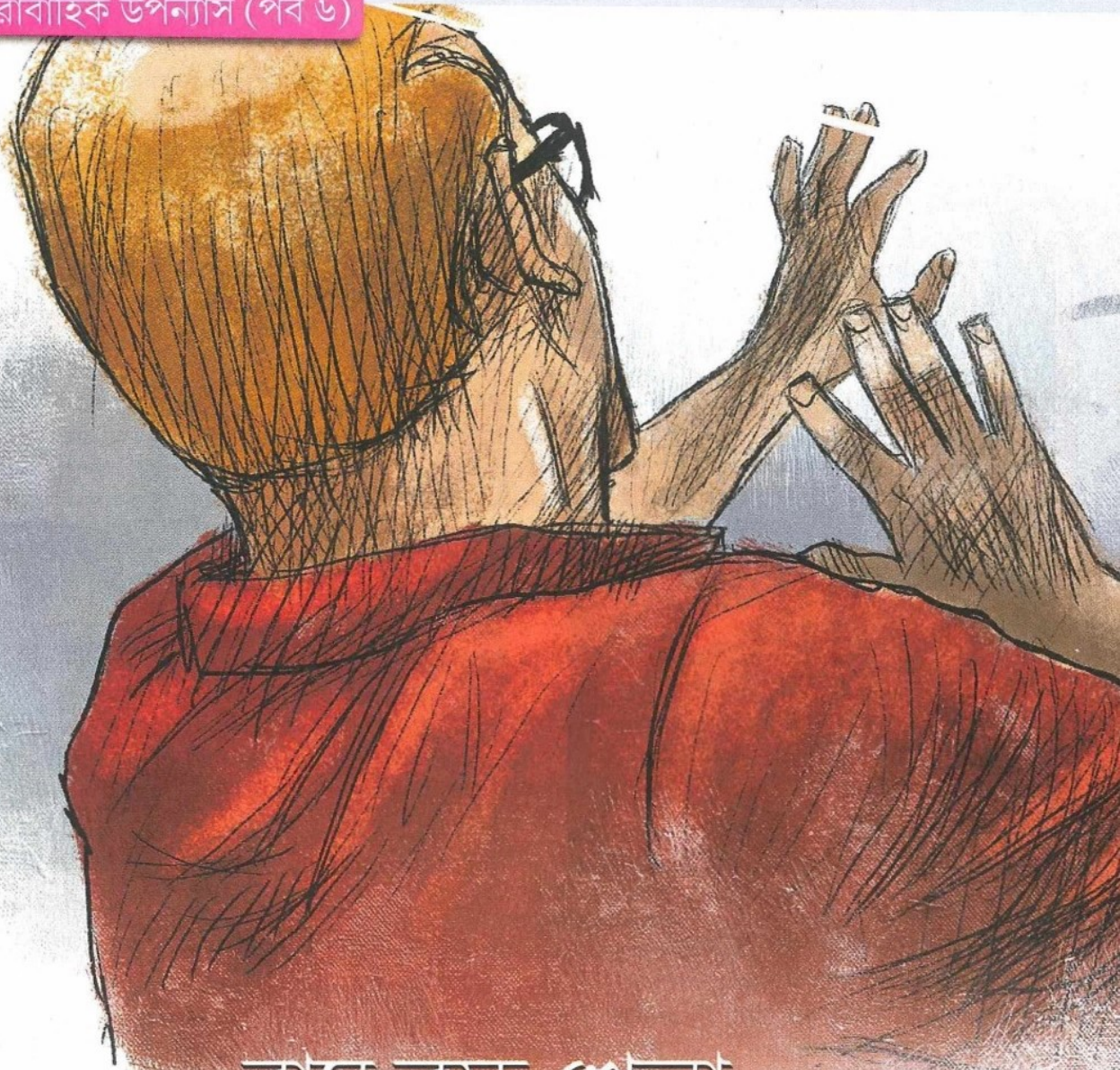
বাঘ ব্রহ্ম খেলা

রূপম ইসলাম

*(**আগে যা হয়েছে:** ব্রহ্ম ঠাকুর আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে জনের হাতে নিজের রিভলভার তুলে দিয়ে তাঁকে মেরে ফেলতে বললেন। যদিও তাঁর হাসি দেখে মনে হয়, এটি নিছক খেলা। এ দিকে এই ঘটনার ঠিক আগেই ডার্ক ওয়েবের এক গোপন লিঙ্কে এরিক দত্তর চিঠি পড়ে ব্রহ্ম ঠাকুর উত্তেজিত হয়ে পিঙ্ক ফ্লয়েডের গান শুনতে থাকেন। প্রথম অ্যালবামের 'চ্যাপ্টার চব্বিশ' গানটিতে তিনি এক রহস্যময় বার্তা খুঁজে পান। পিঙ্ক ফ্লয়েড থেকে বেরিয়ে সিড ব্যারেট যে প্রথম অ্যালবামটি করেন, সেটিও শোনেন। শোনার পরই চিঠি লিখে ব্রহ্ম ঠাকুর এরিককে জানান, চ্যাপ্টার চব্বিশ গানে তিনি খুঁজে পেয়েছেন সপ্তম ইউএফও-র ইশারা। পরের অ্যালবামটিতেও গানের মধ্যে দিয়ে ভিনগ্রহীদের সঙ্গে যোগাযোগের সূত্র তুলে ধরেন তিনি।)*

অ্যালবামের দু'নম্বর গান তো হল! এ বার আমি সঙ্কেত খুঁজতে বসলাম চার নম্বর গানে। দু'নম্বর গানে দ্বিতীয় লাইন এবং চব্বিশতম লাইনে সঙ্কেত পাচ্ছি। সেই হিসেবে চার নম্বর গানের চতুর্থ লাইন এবং চব্বিশতম লাইন ইম্পর্ট্যান্ট হওয়ার কথা।

চতুর্থ গানের নামটাই স্পেশ্যাল। নামটা হল 'নো ম্যান'স ল্যান্ড'। অফকোর্স নো ম্যান'স ল্যান্ড।

কারণ, উই আর টকিং অফ এলিয়েনস হিয়ার, আর্ন্ট উই? ম্যানস-এর কথা তো হচ্ছে না! তাই নো ম্যান'স ল্যান্ড।

এই গানের চব্বিশ লাইন নেই। যা বলার, যা সূত্র দেওয়ার, চতুর্থ লাইনেই দেওয়া আছে। চতুর্থ লাইন থেকে চার লাইন তুলে দিচ্ছি—

Oh, understand!
They even see me under call
We under all
We all follow foot crawl

'See me under call'— স্পষ্টতই বেতার যোগাযোগের কথা বলছে। শেষ দু'টি লাইনে কোনও সঙ্কেত দেখে পিছু নিয়ে মাটির তলায় যেতে বলা হয়েছে। 'আন্ডার' শব্দটি এখানে দ্বৈত অর্থবাহী। আমার বিশ্বাস, তোমাদের খুঁজে পাওয়া সিডের অপ্রকাশিত গানগুলোতে বা তার আঁকা ছবিতে তোমরা ভিনগ্রহীদের পদচিহ্নের সন্ধান পাবে। আমার নিশ্চিত ধারণা, একটা সুড়ঙ্গপথেই মিলবে ভিনগ্রহীদের রেখে যাওয়া গোপন জ্ঞানের হদিস।

ভাল খবর, আমি অন্য একটা ব্যাপারে শিগগিরই ইংল্যান্ডে আসছি। তবুও মন বলছে, তোমার সঙ্গে দেখা হলেও হতে পারে। তোমার মিশন সফল হোক, এই কামনা করি।

ইতি,
তোমার ডাক্তার
(ব্রহ্মাণ্ড ঠাকুর)

॥ ৭ ॥

ব্রহ্ম ঠাকুর তাঁর হাতে এত ক্ষণ ধরে নাচানো রিভলভারটা জনের হাতে তুলে দিতেই তিনি সেটা নিতে কোনও রকম আপত্তি করলেন না। ঘটনার আকস্মিকতায় ঘাবড়েও গেলেন না। শুধু আগ্নেয়াস্ত্রটা হাতে নিয়ে সরে গেলেন অন্ধকার দেওয়ালটার কাছে।

আশ্চর্য আতঙ্কিত হয়ে এক বার তাকাল ব্রহ্ম ঠাকুরের দিকে, এক বার জন চার্টওয়েলের দিকে। ব্রহ্ম ঠাকুর চোখ ছোট ছোট করে তার দিকে তাকিয়ে হাসছেন— যেন অভয় দিয়ে বলতে চাইছেন— 'ঘাবড়িয়ো না। আমি তো আছি!'

জন চার্টওয়েল আবার পায়চারি শুরু করেছেন দেওয়ালের দিকে ফিরে। যেন ভেবে দেখছেন ব্রহ্ম ঠাকুরের দেওয়া তাঁদের

হত্যা করার প্রস্তাবটি।

তার পর সোজা হেঁটে এসে ব্রহ্ম ঠাকুরের হাতেই ফের তুলে দিলেন রিভলভারটা। বললেন, "না। এ ভাবে নয়। মৃত্যু তোমার হবেই, তবে এ ভাবে নয়। তোমার বন্দুকের নকল বুলেটে আমি ফায়ার করব আর তোমার লুকোনো ক্যামেরায় সে ফটো উঠবে। তুমি আমার বিরুদ্ধে পুলিশে দাখিল করার মতো প্রমাণ পাবে। তা হবে না। আর এই ছেলেটি কী জেনেছে আমার সম্পর্কে? কোনও খারাপ কথা কি? ব্যালেন্স এক আন্তর্জাতিক গুপ্ত সংগঠন বটে। তবে আমি আদৌ তার সভ্য কি না তার কোনও নিরেট প্রমাণ তোমাদের কাছে কিন্তু নেই। আমি যত দূর জানি, সেই সমিতি কোনও অপরাধ করলেও তা করে কোনও না-কোনও দেশের নির্দেশেই। ফলে ক্রিমিনাল তাদের বলবে কী করে? হয়তো কিছু নির্দিষ্ট দেশের গোপন পররাষ্ট্র নীতি সামলাতে কাজে লাগে ব্যালেন্সের হস্তক্ষেপ। সেটা আন্তর্জাতিক শান্তিচুক্তি লঙ্ঘন হতে পারে, কিন্তু পাতি অপরাধ নয়! তার পিছনেও আদর্শ আছে, নীতি আছে। আর আমি তো অস্ত্র নিয়ে তোমার বাড়ি আসিওনি। আমি জানি এখানে মাঝে মাঝেই পুলিশ-প্রহরা থাকে। ওই তোমার বন্ধু গবেষক এরিক দত্তর খাতির আছে কলকাতার পুলিশ মহলে, তোমার যেমন যোগাযোগ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা পুলিশের সঙ্গে, এক সঙ্গে করা কাজের সুবাদে। সবই খোঁজ রাখি। তা তুমি আমার হাতে রিভলভার তুলে দিয়ে প্রমাণ কী করতে চাইছ? তোমার মৃত্যুভয় নেই? আছে! আলবাত আছে। সবারই থাকে। আমি জানি, তুমি আমার প্রস্তাবে রাজি হবে না। তবে তোমারই সম্মানজনক পরিণতির জন্যই প্রস্তাবটা পেশ করছি। আমার প্রস্তাব, তুমি আমার সঙ্গে ইংল্যান্ডে চলো। আমার বাড়িতে। তুমি বিশ্বাস করোনি, কিন্তু গেলে নিজের চোখে সেখানে দেখবে আহত রক্তস্নাত আমার প্রপিতামহকে। তিনিই আমার অসুখ। যদি মনোবিজ্ঞানীর ভড়ং না ধরে থাকো, তবে চ্যালেঞ্জটা নাও। আমায় সারিয়ে তোলো। না যদি তুলতে পারো, আর ধরা যাক, কোনও দুর্ঘটনায় যদি সেখানে মারাও যাও, আমি কেন দায়ী হব? তোমার লুকোনো ক্যামেরায় যতই রেকর্ড করো, আমি জোর গলায় বলছি, তোমার আসন্ন মৃত্যুর জন্য আমি দায়ী নই। থাকবও না। দুর্ঘটনার জন্য কেউই দায়ী নয়, দায়ী শুধুই ঈশ্বর।"

ব্রহ্ম ঠাকুর চুপ করে সবটা শুনলেন। জনের ফেরত দেওয়া রিভলভারটা শক্ত করে ধরে তার দিকে তাকিয়ে থাকলেন কয়েক নিমেষ। তার পর চকিতের মধ্যে সেফটি ক্যাচটা খুলে জনের দিকে গুলি চালালেন। গুলিটা জন চার্টওয়েলের মাথার ঠিক এক ইঞ্চি উপরে, পিছনের দেওয়ালে গিয়ে লাগল। জন চার্টওয়েল ঝাঁপ দিলেন, কিন্তু তত ক্ষণে গুলিটা...

"কী, তোমায় বাঁচানোর জন্য এ বার কি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেবে? গুলিটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে, তা-ই ভাবছ তো? না, তা কিন্তু হয়নি। গুলিটা ঠিক যেখানে মারব ভেবেছিলাম, সেখানেই মেরেছি। তাই ধন্যবাদ দিতে চাইলে আমাকেই দাও! আসলে রিভলভার তোমার হাতে তুলে দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছি যে, তুমি যতটা অসুস্থ বলে নিজেকে দেখাতে চাইছ, তা তুমি নও। বলেছিলাম না, একটা ছোট্ট পরীক্ষা নিয়ে প্রমাণ করে দেব তোমার অনেক দাবিই অতিরঞ্জিত, অভিনয়? আমি খুব ভাল করেই জানি, বাঁদর আর পাগলের হাতে অস্ত্র দিতে নেই। এবং আমি এ-ও জানি যে তুমি আমায় এখানে প্রাণে মারতে আসোনি। একটা অন্য ব্যাপার আছে। ব্যাপারটার গন্ধ পাচ্ছি, কিন্তু পুরোটা বুঝছি না। তাই ব্যাপারটা বোঝার তীব্র কৌতূহল হচ্ছে। কৌতূহল বিড়ালনাশক—আমিই কি সেই বিড়াল হব এ বার? নাকি বিড়ালের মতোই আমারও রয়েছে ন'টা জীবন?"

বলেছিলাম না, একটা ছোট্ট পরীক্ষা নিয়ে প্রমাণ করে দেব তোমার অনেক দাবিই অতিরঞ্জিত, অভিনয়? আমি খুব ভাল করেই জানি, বাঁদর আর পাগলের হাতে অস্ত্র দিতে নেই। এবং আমি এ-ও জানি যে তুমি আমায় এখানে প্রাণে মারতে আসোনি। একটা অন্য ব্যাপার আছে। ব্যাপারটার গন্ধ পাচ্ছি, কিন্তু পুরোটা বুঝছি না। তাই ব্যাপারটা বোঝার তীব্র কৌতূহল হচ্ছে। কৌতূহল বিড়ালনাশক—আমিই কি সেই বিড়াল হব এ বার? নাকি বিড়ালের মতোই আমারও রয়েছে ন'টা জীবন?

এই বলে ব্রহ্ম এগিয়ে গিয়ে ভূপতিত, বিহ্বল জন চার্টওয়েলকে উঠতে সাহায্য করলেন, তার কাঁধে-পিঠে আদর করে হাত বুলিয়ে দিলেন। তার পর খুব কাছ থেকে তার চোখে নিজের তীব্র চাহনি ভাসিয়ে রেখে বললেন, "ঠিক আছে জন, তোমার কথাই রইল। আমি তোমার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম! তোমার প্রস্তাবে আমি রাজি। হ্যাঁ, আমি যাব তোমার সঙ্গে। তা হলে এসো, আর-এক বার আমার 'সহকারী'র সঙ্গেও আলাপ করিয়ে দিই, ইনি আমার সহকারী নন আসলে, আমার তরুণ বন্ধু, বাংলা ছবির বিখ্যাত নায়ক এবং তরুণ পরিচালক আশ্চর্য বর্ধন স্বয়ং। তা আশ্চর্য, তুমিও চলো। জড়িয়ে যখন পড়েছ, চলো চার্টওয়েল সাহেবকে তার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার একটা সুযোগ দিয়েই দেখা যাক। আগেই বলছিলাম না তোমায়, ভয় পেলে কি আর অ্যাডভেঞ্চার জমে?"

এই বলে ব্রহ্ম ঠাকুর আর-এক বার টেবিলটার কাছে ফিরে গিয়ে রিভলভারটা ড্রয়ারে চালান দিলেন। এবং কড়া চোখে সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললেন, "শোনো হে জন চার্টওয়েল, তোমার প্রস্তাবে আমরা সম্মত হচ্ছি। তবে তোমার যে অসুখের কথা ফলাও করে বলছ, সে অসুখ আসলে তোমার নেই। তেমন মনোবিকার থাকলে রিভলভার হাতে অত যুক্তিপূর্ণ চিন্তা তুমি করতে পারতে না। অবশ্য রিভলভারে আসল গুলিই ছিল আর গোপন ক্যামেরায় কোনও ফটো তোলাও হচ্ছে না। কোনও ক্যামেরাই এখানে নেই। তেমন প্রয়োজন পড়লে আমায় হুটহাট অভিযানে বেরিয়ে পড়তে হয়। ও রকম একটা ক্যামেরা আর তার রেকর্ডিং এখানে পড়ে থাকলে মহা বিপদ, ও সব মোছার সময় তখন কে পাবে? তার উপরে ক্যামেরা থাকলে তা হ্যাক করে অন্য কোনও বুদ্ধিমান মগজ আমার উপরই নজরদারি চালাবে না, তার কি গ্যারান্টি আছে? তবে এটাও ঠিক যে পুরোপুরি সুস্থ তুমি না। তোমার প্রতিশোধস্পৃহা একটা শক্ত অসুখ তো বটেই। তোমারই ডেরায় পৌঁছে যদি দ্বন্দ্বযুদ্ধে

তোমায় হারিয়ে দিতে পারি, সে ক্ষেত্রে তোমার ওই অসুখটুকু সারলেও সারতে পারে। তবে কী জানো, এটা ছাড়াও অন্য একটা ব্যাপারে, না না, দুটো ব্যাপারে আমার দুটো জেনুইন খটকা...” ব্রহ্ম ঠাকুর কথা থামিয়ে খানিক ক্ষণ ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন জন চার্টওয়েলের দিকে। তার পর বললেন, “ওই খটকা দুটোই আসল চুম্বক! আমি যাব সাহেব তোমার বাড়ি। না গেলে খটকা দুটোই তো আমায় জানে মেরে দেবে! হাঃ হাঃ! কী জ্বালা! আচ্ছা, বলো কবে রওনা দেব আমরা? জায়গাটার নাম যেন কী বলেছিলে... তোমার বর্তমান বাড়ির ঠিকানাটা যেন কী? এসেক্সের ম্যাচিং বলে একটা গ্রাম— ঠিক বললাম তো? হুঁ হুঁ, স্মৃতিশক্তি চট করে এখনও ধোঁকা দেয় না আমায়, যতই তোমরা বুড়ো ভাবো না কেন এই মাথাটাকে!”

শেষ কথাটা অবশ্য ব্রহ্ম বলেছিলেন আশ্চর্যের দিকে তাকিয়ে। কথাটা বলতে বলতে তাঁর ঠোঁটের কোণে খেলা করেছিল পরিচিত সেই রগুড়ে হাসি।

॥ ৮ ॥

আজ রোদ উঠেছে। শীতল কিন্তু স্নিগ্ধ হাওয়া বইছে। রোদের আমেজটা তার মধ্যে বেশ আরামের ব্যাপার। কেমব্রিজ শহরের সেন্ট মার্গারেট স্কোয়্যারের হালকা খয়েরি ছোটখাটো একটা দোতলা বাড়ি— তার সামনের সবুজ লনে বসে কথা বলছেন চার জন মানুষ। একটু আগেই ওঁদের লাঞ্চ শেষ হয়েছে। এখন আড্ডার অঙ্গ হিসেবে কেউ কফি, কেউ অন্য পানীয়ে চুমুক দিচ্ছেন। একেবারে ডান দিকে বসে আছেন এরিক দত্ত।

বাড়িটির বর্তমান মালিক কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্যের অধ্যাপক রায়ান কার্টার বসেছেন এরিকের বাঁ দিকে। এই বাড়িটা বেশ কয়েক বার হাত বদল হয়েছে। জীবনের শেষ অনেক বছর সিড ব্যারেট এই বাড়িতেই থাকতেন। এখানেই ছবি আঁকতেন, ছবি নষ্টও করে ফেলতেন। গানবাজনা তেমন একটা করতেন না আর। টেবিলটার একদম উল্টো দিকে বসা ম্যাথু হার্ডি নামের লোকটি রায়ান কার্টার ও জ্যাক স্পায়ার্সের কমন ফ্রেন্ড, হ্যাঁ এই জ্যাকই হলেন আজকের আড্ডার চতুর্থ জন। জ্যাক ছিলেন সিড ব্যারেটের নতুন ব্যান্ড ‘স্টারস’-এ তাঁর সহকর্মী। এরিকের সঙ্গে হার্ডির পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন জ্যাক, যখন অনেক দিন আগে এরিক বলেছিলেন, সিডের শেষ জীবনের কাজগুলো নিয়ে একটা গবেষণার প্রয়োজন। এরিকের কথাতেই হার্ডি এই বাড়িতে এসে খোঁজাখুঁজি করেছেন, বাড়ির মালিক কার্টারও এতে আগ্রহী ছিলেন, তিনি অধ্যাপক মানুষ, স্বভাবগত ভাবেই শিল্প-সাহিত্যে অনুসন্ধিৎসু। ফল মিলেছে। চিলেকোঠার ঘরের এক লুকোনো চেম্বারে গোল করে গুটোনো চারটে পেন্টিং পাওয়া গেছে। লুকোনো ছিল বলেই এত বার হাত বদলের পরেও ছবিগুলো এই বাড়িতেই থেকে গেছিল। অবশ্য ছবিগুলোর প্রত্যেকটারই কোণের দিকগুলো ছেঁড়া। সিড নিজের কাজ খুব একটা দেখাতে চাইতেন না, তাই বোধ হয় লুকিয়ে রেখেছিলেন। জীবনের শেষ বেলার মনোবিকারও এই লুকিয়ে রাখার কারণ হতে পারে। কার্টারের কাছে এগুলো অমূল্য প্রাপ্তি। কোণ-ছেঁড়া হলেও তিনি সেগুলো যত্ন করে বাঁধিয়ে টাঙিয়ে রেখেছেন নীচের তলার বৈঠকখানায়। একটু আগে এ বাড়িতে ঢুকে প্রথমেই সেই তৈলচিত্রগুলো খুঁটিয়ে দেখেছেন এরিক দত্ত। কিছু কী বুঝেছেন তিনি? বুঝে থাকলেও এখনও খোলসা করেননি
অন্যদের কাছে।

শুধু নিজের মনেই এক বার যেন বলে উঠেছেন, ‘উমুয়ামুয়া। আমি এখন যা ভাবছি, তার পিছনে শুধুই একটা শব্দ— উমুয়ামুয়া।’

অন্যরা কেউই কথাটার বিন্দুবিসর্গ বোঝেননি। তাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করেছেন। কিন্তু সবাই সময় দিয়েছেন এরিককে, কিছু বলার আগে নিজের ভাবনাগুলোকে গুছিয়ে নিতে।

এরিক তাঁর গোল ‘লেনন’ চশমাটা মুছে নিয়ে চোখে পরতে পরতে বললেন, “বন্ধুরা, আমার কলকাতাস্থিত বন্ধু এবং সহযোগী, আমি তাঁকে ডাক্তার বলেই ডাকি, পুরো নাম ডা. ব্রহ্ম ঠাকুর। তিনি সিড ব্যারেটের গানগুলো নিয়ে পড়াশোনা করেছেন। সিডের লেখা কয়েকটা লাইন ডাক্তার এবং আমার, দু’জনেরই ইন্টারেস্টিং লেগেছে। বলে রাখা ভাল, এই লাইনগুলো কিন্তু পিঙ্ক ফ্লয়েড ছেড়ে বেরোনোর পর সিডের রেকর্ড করা একক অ্যালবামের গানের লাইন। এর মধ্যে চারটে লাইনের দু’রকম ভার্সান হয়।

“Oh, understand!

“They even see me under call

“We under all

“We all follow foot crawl

“এই লাইনগুলোর অন্য ভার্সানে কেউ কেউ বলেন, শেষ লাইনটা আসলে We under all/ We awful awful crawl.

“কিন্তু আমার কাছে প্রথম ভার্সানটাই অর্থযুক্ত। প্রথমাংশ মনে তো হয়, বেতার যোগাযোগের কথা বলছে। দ্বিতীয় অংশ একটা সঙ্কেত দেখে ভূগর্ভস্থ কোনও একটা সাইটে যাওয়ার কথাই বলছে বলে মনে হচ্ছে। অর্থাৎ লক্ষণীয়, সিডের নজর আকাশের দিক থেকে সরে মাটির তলায় ঢুকছে। এ রকম কেন হবে? তা হলে কি এ ব্যাপারটা কোনও দুর্ঘটনার ইঙ্গিত দিচ্ছে? কোনও ভিনগ্রহী মহাকাশযান কি ল্যান্ড করতে এসেছিল, পারেনি? পৃথিবীর মাটিতে আছড়ে পড়ে আর সিড নিজেই তার প্রত্যক্ষদর্শী ছিল?

“নাহ বন্ধুরা। তেমন কিছু হয়েছিল বলে মনে হচ্ছে না আমার। বরং সিডের লুকিয়ে রাখা চারটি ছবি দেখে আমার অন্য একটা ব্যাপার মনে হচ্ছে। ভিনগ্রহীদের যান ক্র্যাশ করলে ঘটনাটা লুকোনো থাকত না মোটেই। সেটা অনেক বড় ব্যাপার। চার দিকে হইচই পড়ে যেত। কিন্তু এখন আমি যা ভাবছি, তা সত্যি হলে ব্যাপারটা মানুষের বিস্মৃতিতে চলে যাওয়া খুব অসম্ভব কিছু নয়। তা বলে তা যে গুরুত্বপূর্ণ নয়, তাও না।”

চার বন্ধুর কফি পান চলছে কথার ফাঁকে ফাঁকে। এই পাড়াটা এমনিতে নিরিবিলি, খুব একটা লোক চলাচল নেই। সবাই আগ্রহ নিয়ে এরিকের কথা শুনছেন। বাড়ির সামনের সবুজ লনটার প্রান্ত গিয়ে মিশেছে ফুটপাতে। কোনও দেওয়াল বা বেড়া নেই। একটি দস্যি ছোট্ট মেয়ে বেলুন-হাতে চিৎকার করতে করতে আচমকা দৌড়ে গেল সামনে দিয়েই। তার পিছন পিছন ছুটে আসা এক ভদ্রমহিলা এরিকদের দিকে তাকিয়ে বিব্রত মুখে নড করে ছুটে গেলেন বাচ্চাটির পিছনে।

(ক্রমশ)

ছবি: রৌদ্র মিত্র

ঝোলে ঝালে কম্বলে

দেবদত্ত চট্টরাজ

এক-একটা দিন থাকে, যে দিন কোনও কাজ করতে ইচ্ছে করে না। শুধু অলস ভাবে বিছানায় পড়ে থাকতে ইচ্ছে করে। মুখে মাছি ভন ভন করলেও হাত দিয়ে তাড়াতেও ভীষণ কষ্ট লাগে। মনে হয় যদি রাজা হতাম, মুখের সামনে আঙুর নিয়ে কেউ খাইয়ে দিত, আস্তে আস্তে চামর

দুলিয়ে মাছি ভাগাত ইত্যাদি। কিন্তু সে সুখ আর আমার কোথায়? কোনও ক্রমে আজ টিউশন যাওয়াটা যদিও বা ঠেকাতে পেরেছি, কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারিনি। কোথায় কার্টুন দেখব, একটু টো টো করে রোদে এ-বাড়ি সে-বাড়ি ঘুরব তা না, বসে আছি অঙ্কের খাতা নিয়ে। আর মাথার উপর আমার দিকে শ্যেন দৃষ্টিতে যিনি চেয়ে রয়েছেন তিনি আমার পরমপূজ্য মাতামহ, অ্যাডভোকেট ত্রৈলোক্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। যেমন তাঁর নাম, তেমনই তাঁর বাজখাঁই গলা। মহাভারতের ঘটোৎকচের সঙ্গে দাদুর চেহারার মিল পাওয়া যাবে। এমন সাত ফুট লম্বা বিশালদেহী আমাদের পুরো তল্লাটে কেউ নেই। লোকে বলে দাদুর চিৎকারে নাকি পাড়া থেকে কাক-চিল সব উদ্বাস্তু হয়েছে। ভাবা যায়! তবে আমি এ কথা বিশ্বাস করি। কারণ আমি নিজে সেই কাকদের উদ্বাস্তু করা আওয়াজ দু'-এক বার শুনেছি। এই রকম দু'-একটা কথা ভাবছি, এমন সময় সপ্তর ডেসিবেলে দাদু চেঁচিয়ে উঠলেন, "এই হতভাগা! এত ক্ষণ ধরে নিজের মনে কী বকে চলেছিস? একটা সামান্য অঙ্ক নিয়ে বসে আছে তো বসেই আছে। দ্যাখ পিঙ্কিকে, তোর চেয়ে পাক্কা দু'বছরের ছোট। সে কখন অঙ্ক শেষ করে বিজ্ঞানের বই ধরে ফেলল। আর তুই? নেহাত আমার নাতি, তাই কিছু বলি না। নইলে এমন কুলাঙ্গারকে চাবকে পিঠের ছাল তুলে নিতে হয়।"

দাদুর শেষ কথাটা আমি গভীর ভাবে ভেবে দেখলাম। দাদুর বৈঠকখানার শঙ্কর মাছের চাবুকটা আমার মানসপটে ভেসে উঠল। কল্পনায় সেই লোমহর্ষক দৃশ্য ভেবেই শিউরে উঠলাম আমি। বার কয়েক ঢোঁক গিলে আবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু দূর ছাই! এ অঙ্ক যে কিছুতেই মগজে ঢুকছে না। পিঙ্কি ফিক ফিক করে হাসছে। দাদার দুর্গতিতে বোনের হাসি পাওয়া যেন জন্মসিদ্ধ অধিকার। আমার ভীষণ রাগ হল। আরে, না না, বোন বা দাদুর উপর নয়। রাগ হল পিকলুমামার উপর।

অ্যাডভোকেট ত্রৈলোক্যনাথের পুত্র। কিন্তু সে চেহারায়, ব্যক্তিত্বে, গলার জোরে এমনকি উচ্চতায় কোনওটাই দাদুর মতো হয়নি। দিদা যখন বেঁচে ছিলেন বলতেন, "পিকলু আমার রোগে ভুগে ঠিক মতো বড় হতে পারলনি গো। ও গোপাল! পিকলুরে একটু দেখবে। বড্ড ছেলেমানুষ ও," এই বলে তিনি কাঁদতেন। যদিও এই রোদনের ঠিক কী কারণ ছিল, তা আমি আজও বুঝতে পারিনি। আমরা গ্রীষ্মে প্রায় মাস খানেকের জন্য মামাবাড়ি যেতাম। যাওয়ার আগে মা প্রত্যেক বার বলত যে, এই বার দাদুকে বলে দেবে যেন লেখাপড়া এক্কেবারে বন্ধ থাকে। কিন্তু হত পুরোপুরি উল্টো। আমাদের যাওয়ার ঠিক পরের দিনই দাদু টিউশনে ভর্তি করে দিতেন। আবার বলতেন, "লেখাপড়া করে যে, গাড়িঘোড়া চড়ে সে।"

কিন্তু আমি তো ঘোড়ায় চড়েছি। মাত্র দশ টাকায়। তার জন্য আবার এত অঙ্ক, ইংরেজি পড়তে লাগে নাকি?

সে যাই হোক। আসল কথা হল আজ এই সুন্দর সকালে আমার ঘুম ভাঙতেই চাইছিল না। এ দিকে টিউশন যেতে দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমাদের মামাবাড়ির রাঁধুনি জটাধারী ওরফে জটামামা এই নিয়ে বার তিনেক আমাকে তুলতে এসেও মুখ শুকনো করে ফিরে গেছে। এমন সময় বাজখাঁই গলায় সারা ঘর কেঁপে উঠল। আমি এক ঝটকায় উঠে বসলাম। শুনলাম দাদু হাওয়াই চপ্পল পরে দোতলা থেকে নামছেন। সেই চপ্পলের চটং-পটং শব্দ আমার শরীরে কাঁপুনি ধরিয়ে দিল। মাথায় জমে উঠল স্বেদবিন্দু। তারা যেন অপেক্ষায় রইল, দাদু ঘরে ঢুকলেই কানের পাশ দিয়ে একটা একশো মিটারের স্প্রিন্টে দৌড় দেবে। বুকের মধ্যে ধুকপুকুনি বেড়েই চলল। দেওয়াল ঘড়ির দিকে চোখ যেতেই বুঝলাম টিউশন যেতে লেট নয়, পড়ানোর সময়টাই অতিক্রান্ত। অতএব এ বার কী বলি?

দাদু ঘরে ঢুকেই চেঁচিয়ে বললেন, "কী হে নবাবপুত্তুর, ঘুম হল? নাকি আরও একটু বাকি আছে?"

আমি আমতা আমতা করে বললাম, "ইয়ে মানে দাদু...আজ শরীরটা না, ভাল নেই।"

দাদু চোখ মুখ কুঁচকে ঠিক তিন দিনের বাসি করলার মতো মুখ করে বললেন, "শরীর কী ভাবে খারাপ হল? কাল অবধি তো দিব্যি ভাল ছিল। আজকেই খারাপ হয়ে গেল?"

আমি একটা ঢোঁক গিলে কাঁচুমাচু মুখ করে বললাম, "শরীর কি আর কাউকে বলেকয়ে খারাপ হয় দাদু। শরীর হল গিয়ে তোমার পুরনো স্কুটারটার মতো।"

কথাটা বলেই নিজেই নিজের জিভ কামড়ে যন্ত্রণায় শিউরে উঠলাম। মনে মনে ভাবলাম, এই রে, এ আমি কী বলতে কী বলে দিলাম! এ যে শাহজাহানকে ময়ূর সিংহাসন নিয়ে খোঁটা দেওয়া হয়ে গেল। দাদু কিন্তু কথাটা শুনে একেবারে অন্ধের চালানি মাছের মতো ড্যাব ড্যাব করে শুধু চেয়ে রইলেন। মুখে কিচ্ছুটি বললেন না। বুঝলাম, কথাটা মোক্ষম হয়েছে। এমন সময় ঘটল সেই ঘটনাটা, যেটার জন্য আমার এই দুর্গতি। দাদু চৌকাঠে পা দিয়েছেন, এমন সময় সোজাসুজি ধাক্কা হয়ে লাগল পিকলুমামার সঙ্গে। দাদু চেঁচিয়ে উঠলেন।

"এই যে ধর্মাবতার। আজ কি প্র্যাকটিসে যাবেন না? ইস! ছি, ছি, ছি! কত কষ্ট করে আমি ওকালতি শিখেছি। আর ইনি, সমস্ত সুযোগ-সুবিধে পেয়েও একটা আস্ত রামছাগল।"

কথাটা শুনে আমি হাসতে চাইনি। কিন্তু সদ্য উদয় হওয়া এক তারকার ছবি দেখে পিকলুমামা যে ভাবে দাড়ি রেখেছে, তাতে করে তার সঙ্গে রামছাগলের তুলনা করায় আমি আর হাসি চেপে রাখতে পারলাম না। জটামামাও রান্নাঘর থেকে খ্যাক খ্যাক করে হেসে উঠল।

এ দিকে পিকলুমামার তো প্রেস্টিজ পাংচার। সে তো রেগে খাপ্পা। কিন্তু দাদুর উপর তো আর রাগ দেখানো যায় না। আর জটামামাকেও বলতে পারবে না। কারণ দাদু মনে করে, এই বাড়িতে জটামামার ভ্যালু পিকলুমামার চেয়ে বেশি। তো রইল বাকি কে? এই আমি। অবোধ, সুশীল এক নিষ্পাপ বালক। যে কিনা একটু হেসেছিল। তার উপর ভিসুভিয়াসের তপ্ত লাভার মতো দৃষ্টি হেনে পিকলুমামা দু'বার নিজের ছাগল দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলে উঠল, "বাব্বাহ সোনা। খুব তো হাসি পাচ্ছে। তা দাদুকে কি টিউশনের কথাখানা বলেছ?"

কথাটা শুনেই আমার মনে হল যেন কেউ আমাকে মারিয়ানা খাতের গভীরে ফেলে দিয়েছে। যেখান থেকে আমি আর কোনও দিনও পৃথিবীর আলো দেখতে পাব না। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেছি। আমার চমক ভাঙল দাদুর

গুরুগম্ভীর শব্দে।
"কী? কিসের কথা?"
"না, দাদু, আসলে আমি তোমাকে বলতাম।"
"কবে বলতে শুনি?"
"এই... আজই, হ্যাঁ হ্যাঁ আজকেই বলতাম।"
"তা শুনি সেই কথা।"
"ইয়ে মানে দাদু আসলে... কী হয়েছে বলো তো? হঠাৎ কিছু বলা নেই কওয়া নেই, হুট করে স্যর এক দিন পরীক্ষা বলে দিলেন। আমি তো জানতামই না..."

আমার কথার মাঝেই পিকলুমামা একটা বিতিকিচ্ছিরি শব্দ করে বলে উঠল, "উঁ... হুট করে পরীক্ষা! জানতামই না! বলি, টিউশনে কি ভসভসিয়ে ঘুমোতে যাস?"

আমার কথাটা শুনে খুব কষ্ট হল। কিন্তু দাদু দেখি এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে। আমি কাঁদো কাঁদো চোখে কথাটা বলে কিছুটা সিমপ্যাথি আদায় করব, তার আগেই পিকলুমামা বলে উঠল, "শোনো বাবা। আমি বলছি। এই তোমার নাতি। অঙ্কে শূন্য পেয়েছে। একেবারে গোল্লা। পরিবারের এখনও অবধি সব চেয়ে কম নম্বর পেয়েছিলাম আমি—চার। তার জন্য তুমি আমাকে কম কথা শোনাওনি। কিন্তু আজ তোমার নাতি সেই রেকর্ডও চুরমার করে দিয়েছে।"

আমার চোখ ঠেলে জল বেরিয়ে আসছিল। মনে হল, ভরা সভায় পিকলুমামা আমাকে একেবারে কাদায় ফেলে দিয়েছে। একটু হেসে ফেলেছিলাম, তার এত বড় সাজা দিল! আমি চোখের জল ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করলাম, আমি অঙ্কে একশো তুলব অথবা পিকলুমামাকে মোক্ষম জবাব দেব।

কিন্তু আমার এই 'ভীষ্ম' প্রতিজ্ঞার মধ্যে প্রথম ঘণ্টা যেতে না-যেতেই প্রথম শর্ত ভেঙে গেল। আমি চোখে সর্ষে ফুল দেখতে পেলাম। লাভ, ক্ষতি আর সুদ-কষার চক্রব্যূহে আমি আহত অভিমন্যু হয়ে পড়েছিলাম। উল্টো দিকে দ্রোণ, ভীষ্ম, কর্ণের মতো দাদুর শ্যেনদৃষ্টি, বোনের ফোকলা দাঁতের হাসি আর পিকলুমামার তির্যক ব্যঙ্গ আমাকে জর্জরিত করে তুলেছিল। দাদু খুব সহজেই বুঝে ফেলল, আমার অঙ্কে শুধু দুর্বলতা নেই, একেবারে 'ক' অক্ষর গোমাংস অবস্থা! অগত্যা আমি এখন বোনের কাছেই অঙ্কের কেঁচে গণ্ডূষ করছি। সে-ও সুযোগ পেয়ে দাদুর সামনে নিজেকে শকুন্তলা দেবী আর আমাকে মূর্খ প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লেগেছে। এই সমস্ত অপমান আমি সহ্য করে নেব। কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞার দ্বিতীয় ভাগ আমি ভুলব না। ওই পিকলুমামাকে আমিও নাকানি-চোবানি খাওয়াবই খাওয়াব।

অপমানে, রাগে, কান্নায় আমি প্রায় মেঝেয় মিশে যাচ্ছি, এমন সময় আমাদের বাড়ির বেল বেজে উঠল। সেটার বিশ্রী ক্রি-ই-ই-ই-ই....ইং শব্দ শুনে জটামামা দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলল। দাদু সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, "কে এসেছে রে জটা?"

জটামামা বলল, "বাবু, লাখপতিয়াজি এসেছেন। ওঁকে কি চেম্বারে বসতে বলব?"

মনোহরলাল লাখপতিয়া দাদুর খাস মক্কেল। তাই সে এসেছে শুনেই দাদুর মুখে যে বিষাদ লেগে ছিল, তা নিমেষে চলে গিয়ে ফুটে উঠল এক অমলিন হাসি। সময় বেশি না ব্যয় করে দাদু চটি পরে চটং-পটং করে নেমে গেল। এর মিনিট কয়েক পরেই বেশ 'হাহা হিহি'র শব্দ ভেসে আসতে লাগল। আমরাও বেশ উৎসুক হয়ে উঠলাম। তার কিছু ক্ষণ পর মনোহরলালজি দাদুর সঙ্গে উপরের ঘরে উঠে এলেন। তিনি আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "খুব সুন্দর পোতা-পোতি আপনার। একদম রসমালাই আছে। হে হে। উকিলবাবু, আপনার জন্য আমার কারোবার বাঁচাতে পেরেছি। এই এহসান আমি কোনও দিনও ভুলব না। আজ আমার মেয়ের শাদি আছে। আপনি কিন্তু বাচ্চে লোগোকো সাথ পুরা পরিবার আসবেন।"

দাদু উত্তরে কী বলল, আমি তা আর শুনিনি। কারণ তত ক্ষণে আমার জিভের জল মেঝেয় গিয়ে পড়ার উপক্রম। আমার আবার বিয়ের ভোজের প্রতি একটা প্রচণ্ড দুর্বলতা আছে। আর সেই বিয়ে যদি এমন বড়লোকের হয়, তা হলে আর কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না। মনের মধ্যে রকমারি মিষ্টি, আইসক্রিম, পোলাও, মাংস চক্রাকারে পাক খেতে থাকল। এমন সময় টকাস করে একটা মোক্ষম গাঁট্টা কষিয়ে দিল পিকলুমামা। আমি মা'র নাম নিয়ে চিৎকার করে তাকাতেই দেখি, পিকলুমামা মুখ ভেংচে তাকিয়ে আছে।

"কী রে, হ্যাংলা! নিমন্ত্রণের নাম শুনে যে অঙ্ক করতেই ভুলে গেলি," এই বলে খ্যাক খ্যাক করে হেসে উঠল।

আমার মনের মধ্যে ধিক ধিক করে জ্বলে উঠল রাগের স্পৃহা। কিন্তু আমি কিচ্ছু বললাম না। শুধু অপেক্ষা করলাম।

এই নিমন্ত্রণে সব্বাই খুশি। দুপুরের খাওয়া শেষ করেই সবাই একটু গড়িয়ে নিল। টুকটাক গল্পগুজব করতে করতেই দেখি দাদু নাক ডাকছে। আমি ধীরে ধীরে পা ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। বাইরে বেরোতেই দেখি, বোন নিজের ঘরে খেলনাবাটি নিয়ে বসে আছে আর জটামামা খাটিয়ায় ঘুমোচ্ছে। আমি সন্তর্পণে এগিয়ে গেলাম উপর তলায়। যত উপরে উঠছি, ততই এক মৃদু গানের গলা ভেসে আসছে। আমি পা টিপে টিপে উপরে উঠে দেখি, সে এক আজব কাণ্ড!

পিকলুমামা নিজের শুদ্ধ বাংলা স্বরে ইংরেজি গান ধরেছে। মিউজ়িক সিস্টেমে বেজে চলা বিটল্‌স পিকলুমামার গলায় হুলিয়া বদলে রামপ্রসাদি হয়ে গেছে। সে যাই হোক! আমি এই গান বহু বার শুনেছি, তাই আমার আর হাসি পায় না। আমি উপরে উঠে ভাবছি, এ বার কী করব? এমন সময় চোখাচোখি হয়ে যেতেই পিকলুমামা খ্যাক করে আমার হাত ধরে বলল, "এই যে ভাগ্নে, একদম ঠিক সময়ে এসেছিস। নে, একটা কাজ করে পুণ্য লাভ কর।"

আমার মুখ বেজার হয়ে গেল। আমি বললাম, "না। আমি তোমার কোনও কাজ করতে পারব না।"

পিকলুমামা চোখ কপালে তুলে বলল, "হোয়াট! মামার কথার অমান্য। না না, সত্যি আজকাল আর ভালর যুগ রইল না।"

তার পর আমার কান মলে দিয়ে বলে উঠল, "সব তোর ভালর জন্য করি রে, গর্দভ! আমি না থাকলে আজ তোর যে অঙ্কে দুর্দশা, তা কে জানতে পারত? যা করি, সব তোর ভালর জন্য। নে, নে, আর নাকে কাঁদিস নে।"

কথাটা বলেই পিকলুমামা আমার হাতে ধরিয়ে দিল নিজের সদ্য কেনা ব্লেজ়ার ও তিনটে জ্যাকেট। তার পর পকেট থেকে একশো টাকা বের করে বলল, "যা রশিদের লন্ড্রিতে ছুটে গিয়ে দিয়ে আয়। আর বলবি আজ সন্ধেবেলার মধ্যেই ড্রাই ওয়াশ করে দিতে। কত দিন পর বিয়েবাড়ি যাচ্ছি। উফ!

একটু সাজগোজ না করে গেলে হয়! যা, যা সময় নষ্ট করিস না।"

আমি আর কিছুই বললাম না। কারণ তত ক্ষণে আমার মাথায় এক শয়তানি বুদ্ধি এসে গিয়েছে। মুচকি হেসে টাকাটা পকেটস্থ করে আমি চললাম রশিদ মিয়াঁর লন্ড্রিতে।

সকালের সকল উপহাস আমার মাথায় দুষ্টু বুদ্ধির ফুলঝুরি ছোটাচ্ছিল। আমি যাওয়ার পথেই ব্লেজ়ার আর জ্যাকেটগুলোকে মাটিতে ফেলে দু'বার কত্থক করে নিলাম। ভোরের দিকে হালকা বৃষ্টিতে এমনিতেই রাস্তাটা কাদা হয়ে ছিল। ফলে আমার কত্থকের তালে সেই কাদা একেবারে ভ্যান গখের ছবির মতো জ্যাকেট ও ব্লেজ়ারে ফুটে উঠল। আমি ইচ্ছে করেই ব্লেজ়ারটাকে সবার নীচে রেখেছিলাম, যাতে ওই ছাই রঙে একটা অপূর্ব নকশা হয়। এর পর নাচতে নাচতে চললাম রশিদের লন্ড্রি।

আমার আনা ড্রেসগুলো দেখেই রশিদ বলে উঠল, "এ বাবা! ভাই, এটা কী নিয়ে এসেছ? এত নোংরা কী করে হল?"

আমি মুখ কাঁচুমাচু করে বললাম, "আর কী বলি দাদা? পিকলুমামাকে তো চেনোই। ছোটতেই দু'ফোঁটা পোলিয়ো ড্রপের এক ফোঁটা বাইরে পড়ে গেছি ল। তাই তোমার কাছে আসতে গিয়েই তো হোঁচট খেয়ে নর্দমার কাছে কাদায় পড়ে গেল। অগত্যা আমি এগুলো নিয়ে এলাম।"

রশিদ বড্ড সরল মানুষ। আমার কথা গোগ্রাসে গিলে চুক চুক করে মাথা ঝাঁকাল। তার পর বলল, "তা, কবে ফেরত চাই?"

আমি বললাম, "তুমি সময় করে দিয়ো। ভাল করে ওয়াশ করবে, কেমন?"

এই বলে আমি মনের সুখে চললাম বাড়ি। এই ঘটনার পর যে একটা তুলকালাম হবে, তা আর বলতে বাকি ছিল না। পিকলুমামা সন্ধেবেলা গিয়ে দ্যাখে যে, ওর ড্রেস ওয়াশ হয়নি। এমনকি পিকলুমামা নাকি পোলিয়োর মাত্র এক ফোঁটা খেয়েছে, এ কথাও রশিদের মুখ থেকে সর্বত্র মুখে মুখে ঘুরছে। অতএব রাগে, লজ্জায় দাঁত কিড়মিড় করে মামা ফেরত এসেই আমার কান দুটো মুলো তোলার মতো করে তুলে দিল। আমার সেই চিৎকার শুনে দাদু এসে মামাকে নিরস্ত করলে আমি রক্ষা পেলাম। আমি যে একটা খারাপ কাজ করেছি, সেই অনুশোচনা তত ক্ষণে আমার হয়ে গিয়েছিল। আমি ক্ষমা চাইলাম মামার কাছে। কিন্তু মামার মুখ বাংলার পাঁচ হয়েই রইল।

এর পরের যে ঘটনাটা ঘটল, সেটা আমাদের পরিবারের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে, এ কথা আমি দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পারি। পিকলুমামা রাগে ফুঁসছিল, কিন্তু বিয়েবাড়ির ভোজের লোভ ছিল তার চেয়েও প্রবল। অগত্যা এই ঠান্ডায় মামা এক খান পাতলা সুতির জামা আর প্যান্ট পরে রেডি হল। এ দিকে ঠান্ডায় যে তার মুখ পানসে হয়ে গিয়েছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। জটামামা বহু বার বলেও তাকে সোয়েটার পরাতে ব্যর্থ হল।

আমি লজ্জিত ছিলাম আমার কৃতকর্মের জন্য, কিন্তু আমার দুষ্টু বুদ্ধির তখনও কিছু অবশিষ্ট ছিল। হঠাৎ মামাকে ও রকম অসহায় দেখে মাথায় আর-একটা ফন্দি এল। আমি সোজা দৌড় লাগালাম দাদুর ঘরে। ঘরে ঢুকেই দেখি দাদু তাঁর বনেদি পাঞ্জাবি, ধুতি আর শাল গায়ে নিয়ে এক্কেবারে রেডি। আমাকে দেখেই দাদু বলল, "সবাই রেডি তো? তা হলে মল্লারকে বল গাড়িটা বাইরে বের করতে।"

আমি অসহায় মুখ করে গলা কিঞ্চিৎ খাদে নামিয়ে বিনীত ভাবে বললাম, "দাদু, আমার ভুল হয়ে গেছে। কিন্তু মামাকে এ ভাবে দেখে আমার কষ্ট হচ্ছে।"

দাদুর মন গলে জল হয়ে গেল। বলল, "আরে ঠিক আছে। ছেলেমানুষ ভুল করবে না তো কি ওই ধেড়ে রামছাগলটা করবে?"

আমার মুখে একটা দুষ্টু হাসি খেলা করে গেল। আমি আরও বললাম, "কিন্তু দাদু, এই ঠান্ডায় পিকলুমামা যদি ব্লেজ়ার না পাওয়ায় এ ভাবে স্টাইল করে পাতলা জামা পরে যায়, তা হলে তো শরীর অসুস্থ হয়ে যাবে!"

আমি ইচ্ছাকৃত ভাবে 'স্টাইল' কথাটা ঢুকিয়ে দিয়েছি। কথাটা শোনা মাত্রই দাদু কথাটা লুফে নিল। নিজের জুতো জোড়া পরে হনহনিয়ে দাদু এগিয়ে চলল পিকলুমামার ঘরে।

এ দিকে ঠান্ডায় কাঁপতে কাঁপতেও পিকলুমামা এমন ভান করছিল, যেন কিছুই হয়নি। দাদু এসেই হুঙ্কার দিয়ে বলল, "কী রে হতচ্ছাড়া, তুই নাকি সোয়েটার পরবি না?'

পিকলুমামার মুখ কালো হয়ে গেল কথাটা শুনেই। উত্তর দিতে গিয়ে শব্দের সঙ্গে শব্দ তালগোল পাকিয়ে গেল। দাদু মামার কোনও উত্তরের পরোয়া না-করেই বলল, "জটা, এক্ষুনি আমার কাশ্মীরি শালটা নিয়ে আয়।"

এর পর যা ঘটল, তাতে আমাদের সকলের মুখ হাঁ হয়ে গিয়েছিল। দাদুর যে একটা কাশ্মীরি শাল আছে আমি শুনেছিলাম, কিন্তু সেটা দেখার সৌভাগ্য হয়নি। তবে এ বার তা হল। জিনিসটাকে শাল বললে হয়তো এর অপমান করা হবে। এটা আসলে একটা বিশালাকার কম্বল। পিকলুমামা সেই শাল গায়ে দিতেই কেমন জানি মনে হল, গ্রামের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা এক কাকতাড়ুয়া। আমি আর বোন সেই সময়ে কোনও মতে হাসি চাপতে পারলেও বিয়েবাড়িতে অনেকেই তা পারেনি। শালটার দৈর্ঘ্য এতটাই বড় যে, মামা তাতে চার-পাঁচ বার পাক খেয়েও ওর মিটার খানেক মাটিতে ঝুলছিল।

বিয়েবাড়িতে অনেক বাচ্চাই সেজে থাকা মিকি মাউসের চেয়ে মামার কাছে এসে ভিড় করছিল। ধীরে ধীরে সেই বিয়েতে পাত্র-পাত্রী নয়, পিকলুমামাই হয়ে গিয়েছিল মধ্যমণি। তবে এখনও আর একটু বাকি ছিল। আর সেটা পূর্ণ হল খেতে বসে। শালের চক্রব্যূহ ভেদ করে হাত বের করতে গিয়ে মামা নিজের মাংসের বাটি উল্টে শালের উপর ফেলল। দাদু নিজের দামি শালের এই অবস্থা দেখে বিয়েবাড়িতেই পিকলুমামাকে সর্বসমক্ষে 'রামছাগল' বলে বসল। পিকলুমামার নাকানি-চোবানি অবস্থা দেখে আমার বেশ হাসি পেল। ইচ্ছে করল, 'হুররে' বলে চিৎকার করে উঠি। তবে সে আর করতে হল না। কারণ লোকমুখে গুজব ছড়াতে ছড়াতে তিল থেকে তাল হতে সময় নেয় না। পিকলুমামা যে সবার কাছে আস্ত জোকার প্রতিপন্ন হয়েছে, তাও আর বলার অপেক্ষা রাখে না। আমন্ত্রিত সবাই যে যার মতো বাড়িয়ে চড়িয়ে পিকলুমামাকে নিয়ে খুব রসিকতা করেছিল সে দিন। তবে কি জানেন? আমার আজও মনে হয় দিদা পিকলুমামার কথা ভেবে ভেবে স্বর্গ থেকে অবশ্যই বলছেন, "ও মোর গোপাল, পিকলুরে তুমি একটু দেখো।"

ছবি: রৌদ্র মিত্র

টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুল, নবদ্বীপ

মাত্র আট বছরেই স্কুলটি হয়ে দাঁড়িয়েছে নবদ্বীপ অঞ্চলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

নবদ্বীপ অঞ্চলের বেশ নামী স্কুল টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুল। হালে ওই অঞ্চলের শিক্ষা বিস্তারে এই স্কুলের গুরুত্ব অনেক। টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুলের এই নবদ্বীপ শাখাটির প্রতিষ্ঠা ২০১৫ সালে, টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের কর্ণধার সত্যম রায়চৌধুরীর উদ্যোগে। নবদ্বীপের দণ্ডপাণিতলা মোড়ে। তখন শিক্ষিক-শিক্ষিকা ছিলেন দশ-এগারো জন। আর ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাটা ছিল মোটামুটি শ'দেড়েক। তবে এক বছরের মধ্যেই স্কুলটির আয়তন ও পরিধি খানিক বাড়ে। ২০১৬ সালে নবদ্বীপের মণিপুর ঘাট রোডে গড়ে ওঠে তিন তলা বিল্ডিং। নিজস্ব খেলার মাঠ। তখনও ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল কমই। দুশো কুড়ি জন। সিবিএসই বোর্ডের অনুমোদিত এই স্কুলে এই মুহূর্তে শিক্ষার্থীর সংখ্যা নশো চুয়ান্ন জন। শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছেন একচল্লিশ জন। কম সময়ে হলেও অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে শিক্ষাদানই এই স্কুলকে এগিয়ে নিয়ে গেছে।

স্বাক্ষর চক্রবর্তী, প্রিন্সিপাল

স্কুলের প্রিন্সিপাল স্বাক্ষর চক্রবর্তী সম্প্রতি এই স্কুলের দায়িত্ব পেয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করেন, ছাত্রদের সাফল্য তখনই আসতে পারে, যদি তারা খুশি থাকে। তারা বিজ্ঞান, কলা, বাণিজ্য... যা-ই পড়ুক না কেন, ভবিষ্যতে যে পেশার সঙ্গেই জড়িত থাকার তাদের ইচ্ছে থাকুক না কেন।

তাঁর কথায়, "স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য। অভিভাবক কিংবা শিক্ষক-শিক্ষিকা, ম্যানেজমেন্ট কারও জন্যই নয়, শুধুই ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য। স্কুলের ক্লাস, পড়াশোনা, পরিবেশ পুরোটাই ছাত্রছাত্রীরা যেন উপভোগ করতে পারে।"

ক্লাসরুমে ছাত্রছাত্রীরা

কেবলই পড়াশোনা নয়, 'শিক্ষা' শব্দটার সঙ্গে খেলাধুলো, বিতর্ক, কুইজ় প্রতিযোগিতারও যোগ আছে বলেই মনে করেন তিনি। তাঁর বিশ্বাস, এর সবটা মিললে তবেই হতে পারে 'প্রপার এডুকেশন'। এখনও অবধি দশম শ্রেণি অবধিই এখানে পড়ানো হয়। এই বছর থেকে পুরোদমে সিবিএসই অনুমোদিত দ্বাদশ শ্রেণি চালু হতে চলেছে। হিউম্যানিটিজ়, সায়েন্স, কর্মার্স— এই তিনটি শাখার জন্যই চাওয়া হয়েছে অনুমোদন। এই বছর স্কুল থেকে প্রথম বারের জন্য দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষায় বসেছে আটত্রিশ জন ছাত্র-ছাত্রী।

পড়াশোনা তো বটেই, স্কুলে রয়েছে চমৎকার খেলাধুলোর পরিবেশও। এই স্কুল এবং সিবিএসই-র হাবের আরও তিনটে স্কুল মিলিয়ে সম্প্রতি হয়ে গেছে একটা দারুণ ফুটবল ম্যাচও। পুরো খেলাটাই হয়েছে এই স্কুলেরই মাঠে। ফুটবলের পাশাপাশি ক্রিকেটের প্রতি আগ্রহ বাড়াতে স্কুলের মাঠেই রয়েছে ক্রিকেটের প্র্যাকটিস নেট! ক্রিকেট-ফুটবল ছাড়াও মাঠে শিক্ষার্থীরা ভলিবল এবং কবাডি, দুই-ই খেলে। তবে এর পাশাপাশি এই স্কুলের খেলার তালিকায় জুড়তে চলেছে নতুন নাম, খোখো। স্কুল কর্তৃপক্ষ চান, স্কুলের শিক্ষার্থীদের নিয়ে খোখোর একটা টিম তৈরি করতে। ইনডোর গেমেও ছাত্র-ছাত্রীদের খুবই উৎসাহ। রয়েছে টেবিল টেনিস। এ ছাড়া তাদের অত্যন্ত পছন্দের খেলা দাবা। নদিয়ার চেস চ্যাম্পিয়শিপেও এই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা অংশ নিয়েছে। ভবিষ্যতে শিক্ষার্থীদের সাঁতার শেখানোর জন্য স্কুলে সুইমিং পুল বানানোরও চেষ্টায় রয়েছেন স্কুল কর্তৃপক্ষ।

স্কুলে রয়েছে নানা ধরনের ক্লাব। কোনওটা বিতর্কের। কোনওটা কুইজ়ের। কোনওটা আবৃত্তির। আবার কোনওটা একাঙ্ক নাটকের। গান ও নাচের ক্লাব তো রয়েছেই। এমনকি শেখানো হয় বেহালাও। প্রতি সপ্তাহে

স্কুল ভবনের সামনে

শরীরচর্চার মুহূর্তে
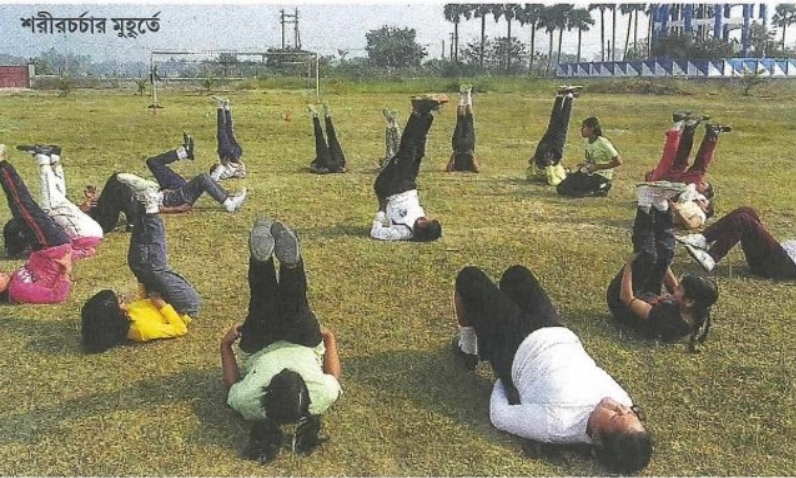
শুক্রবার করে পালন করা হয় 'অ্যাক্টিভিটি ডে'। এই দিন স্কুলের সব ছাত্র-ছাত্রীই নিজের পছন্দমতো কোনও না-কোনও অ্যাক্টিভিটির সঙ্গে যুক্ত থাকে।
কো-এডুকেশন এই স্কুলটির প্রথম ভাষা ইংরেজি। দ্বিতীয় ভাষার ক্ষেত্রে রয়েছে বাংলা বা হিন্দি— যে কোনও একটি ভাষা নেওয়ার সুযোগ। যদিও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ছাত্র-ছাত্রীরা দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষাকেই বেছে নেয়। সে ক্ষেত্রে তারা তৃতীয় ভাষা হিসেবে নেয় হিন্দি। আবার যারা দ্বিতীয় ভাষা হিন্দি নেয়, তাদের ক্ষেত্রে তৃতীয় ভাষা হয় বাংলা। লকডাউন পেরিয়ে ২০২২ সাল থেকে স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীরা পুরোদমে আসা শুরু করে। কিন্তু স্কুলের পুরনো পরিবেশের সঙ্গে তাদের মানিয়ে নিতে মাস তিনেক সময় লেগে যায়। তখন বাচ্চাদের ব্যবহারজনিত সমস্যাও দেখা যাচ্ছিল। তবে সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকার চেষ্টায় সেই কঠিন সময়টা পেরিয়ে এসেছে স্কুল। বাচ্চাদের পড়ার অভ্যেস ফিরিয়ে আনতে স্কুলে রয়েছে রীতিমতো নানা ভাষায় সংবাদপত্র পাঠের চর্চা। তবে মনে মনে পড়া নয়। জোরে জোরে সবার সামনে পড়তে হয়। স্কুল কর্তৃপক্ষের বিশ্বাস, এতে ছাত্র-ছাত্রীদের জড়তাও অনেকটাই কেটে যায়। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকারা কাছেপিঠে শিক্ষামূলক ভ্রমণেও যান। স্কুলে রয়েছে তিনটি স্মার্টবোর্ড ক্লাস। আস্তে আস্তে সংখ্যাটা আরও বাড়ার দিকেই যাচ্ছে। খুবই ছোট্ট একটা লাইব্রেরি দিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল স্কুল। এখন বাড়তে বাড়তে বইয়ের সংখ্যাটা প্রায় চার হাজার। আলাদা করে বসার জায়গা থেকে পড়ার জায়গা, সবই রয়েছে। রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, ভূগোল, কম্পিউটার ইত্যাদি মিলিয়ে স্কুলে ল্যাবের সংখ্যা ৫-৬টি। স্কুলে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও বার্ষিক অনুষ্ঠান হয়। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার দিন শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি তাদের অভিভাবকদেরও অংশ নেওয়ার সুযোগ থাকে। স্কুলে পালিত হয় পেরেন্টস ডে, গ্র্যান্ড পেরেন্টস ডে। এ ছাড়াও আম্বেদকরের জন্মদিন, পয়লা বৈশাখ, রবীন্দ্রজয়ন্তী তো অনুষ্ঠিত হয়ই। সবাই মিলে পালন করা হয় সরস্বতী পুজো থেকে ক্রিসমাস। এমনকি রথও। রকমারি প্রদর্শনীতেও ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহ দেওয়া হয়। কেবল বিজ্ঞান নয়, মডেল তৈরি করে সব বিষয়েরই প্রদর্শনী করে ছাত্র-ছাত্রীরা। সম্প্রতি সিবিএসই-র ইস্টার্ন জ়োনের স্কুলগুলোর মধ্যে হওয়া বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রদর্শনীতেও অংশ নিয়েছে এই স্কুল। স্কুল থেকে তিন মাস অন্তর বেরোয় একটি ই-ম্যাগাজ়িন। নাম 'টেকনো ভাইবস'। পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কেও ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতন করেন স্কুল কর্তৃপক্ষ। এই ধরনের সচেতনতা বাড়াতে ছাত্র-ছাত্রীরা ছোট ছোট কার্ড বানায়। তার পর তা দেয় অভিভাবকদেরও। এই বছর থেকেই টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের এই স্কুলটিতে এনসিসি-ও শুরু হওয়ার সম্ভাবনা। কেবল নবদ্বীপই নয়, স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীরা আসে পূর্বস্থলী ও তার

পরীক্ষাগারে মনোনিবেশের সময়

আশপাশের নানা জায়গা থেকে। অথচ স্কুলটির বয়স মাত্র আট বছর। তার মধ্যেই এক ঝাঁক অত্যাধুনিক পরিকাঠামো নিয়ে এগিয়ে চলেছে নবদ্বীপের এই স্কুল।

নিজস্ব প্রতিনিধি

বিড়াল

সুতপন চট্টোপাধ্যায়

একদিন অখিলকাকা প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে একটা খবর নিয়ে এল। বলল, হাটতলা থেকে আসার পথে সে কবরস্থানের বেল গাছের নীচে এক ফকিরকে বসে থাকতে দেখেছে। ফকির পরে আছে সাদা কাপড়, লম্বা তার দাড়ি। মাথায় গেরুয়া পাগড়ি, কাঁধে লালচে গামছা, গাছের

নীচে চোখ বুজে বসে বিড় বিড় করে মুখে কী সব বলছিল। তন্ত্র-মন্ত্র জানে। শুনে মা বলল, "তুই ওর কাছে আর যাবি না। কী করতে কী করে দেবে। তুই বেনে পাড়ার রাস্তা ধরে হাটতলা যাস। একটু লম্বা পড়বে। তা হোক!"

অখিলকাকা বাবার ছোট ভাই, একটু পাগলাটে ধরনের। অখিলকাকাকে সবাই খুব ভয় করে, কিন্তু আমার সঙ্গে অখিলকাকার খুব বন্ধুত্ব। অখিলকাকা কোনও চাকরি করে না। শুনেছি ইশকুলে পঞ্চম শ্রেণির পর আর এগোতে পারেনি। বাবারা চার ভাই। তিন ভাই আমাদের গ্রামের কাছাকাছি ইশকুলে মাস্টারি করে। সকালে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে যায়, রাতে টিউশন করে বাড়ি ফেরে। অখিলকাকাই কেবল বাড়িতে থাকে, জমি চাষ দেখে আর বাজার-দোকান করে। অখিলকাকা যেহেতু সারা দিন বাড়িতে থাকে, তাই সে মানুষের যে কোনও বিপদ-আপদে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাই অখিলকাকার খুব নামডাক। কিছু হলেই সবাই তাকেই ডাকে। পাগলাটে হলেও, অখিলকাকা খুব ডাকাবুকো।

রঘুনাথপুর আমাদের গ্রাম, খুব বড় নয়, ত্রিশ-চল্লিশ পরিবারের বাস। গ্রামের হাটতলায় উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল। আমাদের গ্রামের এক পাশে কেদারমতী নদী। শুনেছি দামোদর নদের এই শাখা-নদীটি উত্তর দিক থেকে অনেক গ্রামের পাশ দিয়ে গেছে, তার পর আমাদের গ্রামের দক্ষিণ দিক দিয়ে বয়ে গেছে। বর্ষাকালে এই নদী দিয়েই খড়-বোঝাই নৌকা ভেসে যায় কলকাতার দিকে। জেলেদের মাছ ধরার নৌকা ভাসে বিকেলের পড়ন্ত রোদে বা খুব ভোরে। অন্য পারে গরলগাছা গ্রামের ঘন জঙ্গল। সেই জঙ্গল পেরোলেই এই অঞ্চলের বড় কলা বাগান। পাকা কলার কাঁদি-ভর্তি নৌকাও দেখা যায় মাঝে মাঝে।

অখিলকাকা আমার মায়ের খুব ন্যাওটা। কিছু হলেই মা'র কাছে এসে ঘ্যান ঘ্যান করে।

নারকেল কোরা দিয়ে মুড়ি মেখে দিতে হয় মাকে। সে একটু তোতলায়, তাই কেউ তার কথা বেশি ক্ষণ শুনতে চায় না বলে, মা'র কাছে সে গল্পের ঝুড়ি খুলে বসে।

মা শোনে। কাজ করতে করতে মা শুনতে থাকে। অখিলকাকা আর মা'র গল্প আমিও মাঝে-মাঝে শুনেছি। অখিলকাকার তোতলানো শুনতে আমার মাথা ধরে যায়, কিন্তু মা নির্বিকার।

॥ ২ ॥

অখিলকাকা হাটে যাওয়ার সময় মা বলেছিল, "আজ নদীর মাছ পেলে নিয়ে আসবি।"

কেদারমতী নদীতে বিকেলে জাল ফেলে মাছ উঠলে সোজা হাটে চলে আসে। টাটকা মাছ টাটকা বিকোয়। অখিলকাকা "কোনও চিন্তা নেই," বলে বাজারে চলে গেল।

মা কপালে হাত তুলে বলল, "দুগগা, দুগগা।"

সন্ধেবেলা ফিরে আসার কথা। কিন্তু সে দিন অখিলকাকা বাজার থেকে ফিরল না। অনেক ক্ষণ অপেক্ষা করার পর মা বাবাকে বলল, "তুমি একটু দেখো, ছেলেটা গেল কোথায়?"

বাবা বিরক্ত হয়ে বলল, "যাবে আর কোথায়? ফুটবল মাঠে আড্ডা দিচ্ছে দ্যাখো। খিদে পেলে ঠিক আসবে।"

মা বলল, "কী যে যা তা বলো! বাজার নিয়ে অনেক আগেই চলে আসে। তোমার যত আজগুবি কথা।"

বাবা বলল, "ওকে আর আদর দিয়ো না তো! ও অনেক বড় হয়ে গেছে।"

মা বলল, "তবু তুমি যাবে না? তোমারই তো ছোট ভাই।"

বাবা অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলল, "ঠিক আছে, দেখছি।"

রাত ন'টা বেজে গেল, কোথাও অখিলকাকার খোঁজ নেই। বাবা অখিলকাকার খোঁজে হাটতলার সব গলিঘুঁজি খুঁজেছে। চার দিকে লোক পাঠিয়েছে। কেউ কোনও খবর নিয়ে ফেরেনি। বাড়িতে প্রবল চিন্তা!

কী হতে পারে, কোথায় যেতে পারে, কী বিপদের আশঙ্কা... এই সব আলোচনা চলছে সন্ধে থেকে।

বাবার এক বন্ধু বাবাকে বলল, "খরাজদাকে এক বার ডাক। ও এ সব কাজ করে কি না, জানি না। তবে সাপের কাজ করে।"

বাবা বলল, "সাপের কাজ মানে? সাপে কামড়েছে কি না বলতে পারে?"

"আরে না। বাড়িতে সাপ আছে কি না, থাকলে তার দিক বলতে পারে হাত চেলে। অনেকের ক্ষেত্রে মিলেছে।"

বাবা বলল, "এ ক্ষেত্রে কী বলবে? এর সঙ্গে তো সাপের কোনও সম্পর্ক নেই।"

"আরে, খোঁজ তো দিতে পারে!" মা বলল।

সারা রাত প্রায় জাগা। কারও চোখে ঘুম নেই। সবাই যেমন পারছে আন্দাজে ঢিল ছুড়ছে। মা সারা রাত জেগে। চোখ দিয়ে জল পড়ছে। বার বার মুছছে আঁচলে। সকাল হতেই খরাজবাবু এসে হাজির।

বাড়ির ঈশান কোণে বাবু হয়ে বসে সে মাটির উপর হাত রেখে কী সব বিড় বিড় করে বলতে আরম্ভ করল। সবাই অধীর আগ্রহে তার দিকে তাকিয়ে। চোখের পাতা পড়ছে না। কিছু ক্ষণ পরে খরাজবাবু বলল, "এক ফকির অখিলবাবুকে বিড়ালে রূপান্তরিত করে দিয়েছে। সেই বিড়াল এই বাড়ির কাছেই আছে। লক্ষ রাখুন," বলে টাকা নিয়ে চলে গেল। মা এ-দিক ও-দিক দেখতে লাগল।

হঠাৎ বাবার চোখে পড়ল, আমাদের আম গাছের ডালে বসে আছে একটা সাদা-ধূসর রঙের বিড়াল। লেজ নাড়াচ্ছে আর এ-দিক ও-দিক দেখছে।

বাবা বলল, "ওই দ্যাখো, এটাই অখিল। বাড়ি চিনে ঠিক চলে এসেছে।"

মাকে বলল, "এই বিড়ালটাকে কোনও দিন দেখেছ কি?"

মা অবাক হয়ে বলল, "না। আমাদের চেনা বিড়ালগুলো তো ছোট। এত নধর চেহারার নয়।"

বাবা বলল, "আহা, বেচারির সারা রাত খাওয়া হয়নি। ডাকো, কাছে ডাকো। জোয়ান ছেলে। রাতে পেট ভরে খাওয়া অভ্যেস। খেতে দাও, খেতে দাও। তার পর আমি সেই ফকিরকে ধরতে যাচ্ছি। ওকে আবার আসল চেহারায় ফিরিয়ে আনতে হবে তো!"

মা হাত তুলে ডাকতেই বিড়ালটা এক লাফে মায়ের কাছে এসে বসল। জিভ দিয়ে ঠোঁট দুটো চেটে নিয়ে আমার দিকে তাকাল। মা বলল, "খুব খিদে পেয়েছে অখিল?"

বিড়ালটা ঘাড় নাড়ল।

মা বলল, "দুধ-ভাত খাবি? তুই তো কাল মাছ নিয়ে আসিসনি। দুধ-ভাত দেব?"

বিড়াল আবার ঘাড় নাড়াল। আমার আর অবিশ্বাস করার কিছু রইল না। কিন্তু মনে মনে ভাবছি, বিড়াল তো কোনও

দিন কাকা হয় না? তা হলে এখন থেকে বিড়ালটাকে অখিলকাকা বলে ডাকব কী করে? খুব কঠিন কাজ! বিড়াল ছাড়া ফকির অন্য কিছুতে রূপান্তরিত করতে পারত না? আর ঠিক তখনই মনে হল, যা তোতলায়, কী বলতে কী বলেছে, ফকির ঠিক বুঝতে না-পেরে বিড়াল বানিয়ে দিয়েছে।

মা'র কাছে খাওয়ার পর আমি বিড়াল কাকাকে নিয়ে বৈঠকখানায় বসলাম। মাঝ পথে মা ডেকে কানে কানে বলল, "খুব কাছে যাস না। সত্যি অখিল কি না, এখনও প্রমাণ হয়নি। তা ছাড়া আঁচড়ে-কামড়ে যেন না দেয়। কামড়ে দিলেই কিন্তু ইঞ্জেকশন নিতে ছুটতে হবে।"

আমি মা'র কথা মতো বেশ কিছুটা দূরে বসলাম। পেট পুরে খেয়ে বিড়াল কাকার ঢুল এসেছে। সে গুটুলি মেরে বসে ঘুমিয়ে পড়ল। আমায় একটি কথাও জিজ্ঞেস করল না। আমার মনে সন্দেহ হল, আমায় কোনও কথা জিজ্ঞেস করল না অখিলকাকা? এ তো অসম্ভব!

॥ ৩ ॥

আমি বিড়ালটার পাশে কত ক্ষণ বসেছিলাম জানি না। হঠাৎ বাবার গম্ভীর গলায় ঘোর কাটল। বাবা বলছে, "ফকিরটা কোথায় চলে গেছে! বেলতলার নীচে নেই। অনেক খোঁজাখুজি করেও কেউ পায়নি।"

"এ বার কী হবে?" ককিয়ে উঠল মা।

"কী জানি কী হবে! অখিলকে মানুষে রূপান্তরের মন্ত্র আমরা কেউ জানি না। ওকে আর ফেরত পাওয়া মুশকিল।"

"তা হলে?" সকলের এক বাক্যে উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর।

বাবা বলল, "তা হলে আর কী, সারা জীবন অখিল বিড়াল হয়েই থাকবে। লোকের বাড়িতে কি বিড়াল থাকে না?"

মা ঝাঁঝিয়ে বলল, "তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? কী বলছ যা-তা? কিছু একটা করো.." বলে মা ফুঁপিয়ে উঠল।

বাবা বলল, "আচ্ছা, চেষ্টা করছি। ঘটনাটা বেশ সিরিয়াস কি না। পুরো ব্যাপারটা খতিয়ে দেখতে হবে। আমি নানান দিকে খবর পাঠাচ্ছি। ফকিরকে যেখানে পাবে, ধরে নিয়ে আসতে। আর ধরে আনতে পারলে পুরস্কারও মিলবে।"

বিড়ালটা অখিলকাকার মতোই মা'র আশপাশে ঘুর ঘুর করতে লাগল। মা'র মতো দুই কাকিমাও বিড়ালটাকে যখন যা পাচ্ছে, খেতে দিচ্ছে। অখিলকাকা কচুবাটা খেতে ভালবাসে, তাই কচুবাটা আর ভাত দিল মা একটা সানকিতে। মা'র থেকে একটু দূরে বসে সব খাবার সাবাড় করে দিল বিড়ালটা।

দুপুরবেলা মা অখিলকাকাকে জিজ্ঞেস করল, "তুই কেন ওই ফকিরের কাছে গিয়েছিলি? আমি তোকে বাজারে পাঠিয়েছিলাম না?"

বিড়ালটা মিউ মিউ করে কিছু বলতে চেষ্টা করল। বোঝা গেল না। আমি বললাম, "ও তো আমাদের ভাষা বলতে পারে না। আমরাও ওর ভাষা বলতে পারি না। এ বার কী হবে?"

মা বলল, "তুই বিড়ালের ভাষা যে ভাবেই হোক শেখার চেষ্টা কর। না হলে তো খুব মুশকিল। অখিলের মতো তোতলালেও অন্তত বোঝা যেত!"

একে বিড়ালকে কাকা ডাকতে হচ্ছে, তার উপর বিড়ালের ভাষা শিখতে হবে? কে শেখাবে? মাথায় বজ্রাঘাত আমার!

এর মধ্যে মা'র একটা কাজ খুব সোজা হয়ে গেছে। আগে অখিলকাকা অনেক কিছু খেত না। মাছের মাথা, বেগুন, কলমি শাক আরও অনেক কিছু। এখন মাছের কাঁটা, ছাল, মাখা ভাত, তরিতরকারি সব সাবাড় করে দিচ্ছে। আমি এক দিন বিড়ালটাকে গলায় একটা বকলস লাগিয়ে দিতে যাচ্ছি দেখে মা তেড়ে এল।

"করছিস কী, করছিস কী? কাকাকে কেউ বকলস দিয়ে বাঁধে?"

বাবা কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। বিশ্বাস করতে পারছে না, আবার মা'র বিরুদ্ধেও যেতে পারছে না। সংসারের অমঙ্গল। মেজোকাকিমা বলল, "বিড়াল হয়েছে ভাল হয়েছে, অন্য লোককে তো বাপু খেয়ে নেবে না! এখন বাঘ হয়ে গেলে কি সাংঘাতিক অবস্থা হত, এক বার ভেবে দ্যাখো!"

আমরা এক যোগে তাতে সম্মতি দিলাম।

বাবা বলল, "এত ক্ষণে সবাই তার পেটে চলে যেতাম।"

এ সব আলোচনার মধ্যেই হঠাৎ অখিলকাকা এসে হাজির। তাকে দেখে সবাই হতবাক। হাতে একটা থলে। এ দিকে বিড়ালটা কই গেল! তাকেও তো কাছে-পিঠে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

অখিলকাকা তোতলা গলায় বলল, "এ কি! আমায় তোমরা অমন করে দেখছ কেন?"

মা ধরা গলায় বলল, "দেখছি কেন আবার জিজ্ঞেস করছিস? কোথায় ছিল তোর এই চেহারা? বিড়াল সেজেই বা ছিলি কেন?" বলে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল।

অখিলকাকা বলল, "কী যা তা বলছ গো! নদীতে সে দিন দেখলাম ভাল মাছ ওঠেনি। নদীর ঘাটে বলরামের সঙ্গে দেখা। সে বলল, 'চলো, কাল আমাদের পুকুর থেকে মাছ ধরে দেব।' চলে গেলাম। বলরামের মা বলল, 'এক দিন থেকে যা। এখানে পুকুরে মাছ ধরার প্রতিযোগিতা চলছে।'

"ছিপ ফেলে বসে গেলাম। দেখো, কত বড় কাতলা মাছ ধরেছি। বলরামের মা বলল, 'গোটা মাছটা বাড়ি নিয়ে যা।'"

অখিলকাকা ব্যাগ থেকে মাছটা বের করতে আমরা তো অবাক! প্রায় পাঁচ কিলো ওজনের কাতলা।

"ওমা, সত্যি তো!" বলে আমি এগিয়ে অখিলকাকার হাত ধরলাম।

মা বলল, "হাত ছেড়ে দে। ওকে আমার প্রশ্নের জবাব দিতে হবে আগে," মা'র নাকের পাটা ফুলে উঠেছে।

মা বলল, "তুই নাকি কোন ফকিরের কাছে গেছিলি?"

অখিলকাকা বলল, "ফকির? কোন ফকির? কোথাকার ফকির?"

মা বলল, "ওই যে কবরস্থানের কাছে বসে? এক দিন দেখে এসে বলেছিলি। সে তোকে বিড়ালে রূপান্তরিত করে দিয়েছিল?"

অখিলকাকা বলল, "সে একটা ভণ্ড। ভিক্ষে করার জন্য নানান ভেক ধরে। আমাকে বিড়াল করে দেবে কেন?"

বড় বড় চোখে তাকাল মা, "সত্যি কথা বলবি। প্রশ্ন না-করে উত্তর দে।"

বাবা আর থাকতে না-পেরে বলল, "তা হলে বিড়ালটা কে?"

বিড়াল আম গাছের উপর থেকে ডেকে উঠল, 'মিউ, মিউ।'

অখিলকাকা সে দিকে তাকিয়ে তোতলাতে তোতলাতে বলল, "বিড়াল আবার কে হবে? বিড়ালটা বিড়াল!"

ছবি: মহেশ্বর মণ্ডল

উল্কা থেকে তির

সেই তিরের ফলা

উনিশ শতকে সুইৎজ়ারল্যান্ডে খুঁজে পাওয়া গেছিল ব্রোঞ্জ যুগে নির্মিত একটা তিরের ফলা। সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা জানালেন, ওই ফলা তৈরিতে কাজে লেগেছিল লোহা, যা পাওয়া গেছিল আকাশ থেকে খসে পড়া এক উল্কা থেকে। এ-ও জানা গেছে যে, উল্কাটা এস্টোনিয়া নামের এক দূর দেশ থেকে সুইৎজ়ারল্যান্ডে এসেছিল। এ থেকে বোঝা যায়, ব্রোঞ্জ যুগেও বিভিন্ন দূর দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক আদানপ্রদানের সম্পর্ক ছিল।

বাটাগাইকায় বিপদ

রাশিয়ার সেই গহ্বর

রাশিয়ার সাইবেরিয়ায় জঙ্গলের মধ্যে বাটাগাইকা নামে এক জায়গায় প্রায় এক কিলোমিটার লম্বা একটা গহ্বর তৈরি হয়ে দিন দিন বাড়ছে। ওই এলাকায় মাটির তলায় ছিল পারমাফ্রস্ট বা হিমায়িত মাটি। ১৯৬০ সাল নাগাদ আশপাশের জঙ্গল কেটে ফেলার পর থেকেই ওই হিমায়িত মাটির গলন শুরু হয়। ইদানীং চতুর্দিকেই তাপমাত্রা বাড়ছে বলে এই গহ্বর ক্রমে আরও বাড়বে বলে বিজ্ঞানীদের আশঙ্কা।

উড়ে গেল জুপিটার ৩

জুপিটার ৩

উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার ঘরে ঘরে আরও দ্রুত গতির ইন্টারনেট পরিষেবা পৌঁছে দিতে আকাশে উড়ে গেল এখনও অবধি মানুষের বানানো বৃহত্তম কৃত্রিম উপগ্রহ, 'জুপিটার ৩'। ধনকুবের ইলন মাস্কের কোম্পানি স্পেস এক্স-এর রকেট সম্প্রতি এই উপগ্রহকে নির্দিষ্ট কক্ষপথে পৌঁছে দিয়েছে। উপগ্রহটির নির্মাতা কোম্পানির কর্ণধারদের আশা, এই উপগ্রহের দৌলতে আমেরিকার ইন্টারনেট সংযোগ ব্যবস্থায় আসবে বৈপ্লবিক পরিবর্তন।

অশান্ত মণিপুর

বেশ অনেক দিনই হল, ভারতের উত্তর-পূর্বের রাজ্য মণিপুরে লেগে আছে ভীষণ গোলমাল। একাধিক বিবদমান গোষ্ঠীর সংঘর্ষে অশান্ত মণিপুরে জ্বলছে আগুন। কাঁদছেন নিপীড়িত, অসহায় মানুষ। এই অশান্তি থামাতে সেখানকার পুলিশ প্রশাসন ও সরকারকে বার বার ব্যর্থ হতে দেখে উদ্বিগ্ন দেশের শীর্ষ আদালতও।

জ্বলছে মণিপুর

যা হবে

বিশ্ব সিংহ দিবস

সিংহশাবক

পশুরাজ সিংহ এক কালে ইউরোপ, আফ্রিকা এবং এশিয়া, তিন-তিনটে মহাদেশ জুড়ে রাজত্ব করতেন। আজ অনেক বছর হল, ইউরোপে আর সিংহ নেই। আছে এশিয়ার ভারতে। আর আফ্রিকা মহাদেশে। অথচ জঙ্গলের বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষায় সিংহের ভূমিকা অপরিহার্য। খাদ্যশৃঙ্খলের শীর্ষে বসে থাকা সিংহ বিলুপ্ত হলে ভেঙে পড়বে সমস্ত শৃঙ্খলটাই। সিংহদের ভাল রাখতে চেয়ে, ওদের কথা সবাইকে মনে করিয়ে দিতে তাই প্রতি বছর ১০ অগস্ট পালিত হয় বিশ্ব সিংহ দিবস।

বিশ্ব হাতি দিবস

হাতি

পৃথিবীর স্থলভাগে সবচেয়ে বড় স্তন্যপায়ী প্রাণী হাতি। তাকেও পারলে মেরে শেষই করে দেয় মানুষ। এশিয়া ও আফ্রিকার বুদ্ধিমান বাসিন্দা হাতিদের বিপদ বুঝে ২০১২ সাল থেকে প্রতি বছর ১২ অগস্ট সারা পৃথিবী জুড়ে শুরু হয়েছে বিশ্ব হাতি দিবস পালন। উদ্দেশ্য, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বিশালদেহী হাতির অপরিহার্যতা সবাইকে মনে করানো। জঙ্গল কেটে মানুষ চাষজমি কিংবা রাস্তা বানালে অথবা রেললাইন পাতলেও হাতির বিপদ। বিপদ হাতির দাঁত এবং অন্য দেহাংশের লোভে লোভী চোরাশিকারিদের থেকেও। এই গ্রহে মানুষ বাঁচতে চাইলে হাতিদেরও বাঁচাতেই হবে।

ক্যামেরা

বিশ্ব ফটোগ্রাফি দিবস

মানুষ প্রথম ফটো তুলে রাখতে শিখেছে প্রায় দুশো বছর হতে চলল। শুরুর সেই দিন আর আজকের দিন— এর মাঝে ফটোগ্রাফি উন্নতি করতে-করতে আকাশ ছুঁয়েছে। এক কালে এক দিন একটা ফটো তুলতে সারা গাঁয়ের লোক জড়ো হত, আজ হাতের মুঠোর ফোন তাক করে আমরা হুড়মুড় করে ফটো তুলছি। ফটোগ্রাফির প্রযুক্তি আগামী দিনে আরও উন্নতি করবে। কিন্তু এ কথা অনস্বীকার্য, আজও ভাল একটা ফটোর জন্য সবচেয়ে জরুরি, ফটোগ্রাফারের দেখার চোখ। ফটোগ্রাফির জনপ্রিয়তাকে স্বীকৃতি দিতে এবং উৎকৃষ্ট ফটোগ্রাফ আদানপ্রদানের জন্য আজ অনেক বছর হল, ১৯ অগস্ট পালিত হয়ে আসছে বিশ্ব ফটোগ্রাফি দিবস।

পুরনো ডায়েরি

অভিজিৎ রায়

পর্দা সরিয়ে ঘরের ভিতরে উঁকি দিল মনোরমা। জানলার পাশে খাটের উপর বসে ইতিকা। কোলের উপর খুলে রাখা ইতিহাস বই। বিবেকানন্দ শিক্ষা নিকেতনে ক্লাস এইটের ছাত্রী ইতিকা। আজ রবিবার। রবিবার মানেই, 'পড়া কম, খেলা বেশি', এমনই

একটি নীতিতে বিশ্বাসী সে। কিন্তু, এখন পরিস্থিতি একেবারেই অন্য রকম। গত বছর সপ্তম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষায় ইতিকার একেবারে ভরাডুবি অবস্থা। না, ফেল সে করেনি, তবে একটি বিষয়েও পঞ্চাশের গণ্ডি টপকাতে পারেনি। এত দূর অবধিও ঠিক ছিল, আগুনে ঘি ঢালার কাজটা করল ইংরেজি। সর্ব সাকুল্যে একশোতে তিনের পিঠে সাত, অর্থাৎ টেনে-হিঁচড়ে পাশ। এর পর যে ইতিকার রবিবারের সুখের উপর কোপ পড়বে, সে আর আশ্চর্য কী!

কোপটা দিল মনোরমা, মানে ইতিকার মা। যদিও পরীক্ষার ফল-সংক্রান্ত দুর্ঘটনাটি প্রায় মাস তিনেক আগের কথা, তথাপি মনোরমা তার বজ্রআঁটুনি এখনও এতটুকু আলগা করেনি। আর করবেই বা কেন? মনোরমার আশা-আকাঙ্ক্ষার এক মাত্র আশ্রয়স্থল চোদ্দো বছরের এই মেয়েটি। ইতিকার বাবা নেই আজ প্রায় সাত বছর। টিটাগড়ের একটা কটন মিলে মেকানিকের কাজ করত ইতিকার বাবা, সুধাংশু বর্মন। রোজগার আহামরি কিছু না হলেও, সংসার এক প্রকার চলে যেত। কিন্তু সঞ্চয় বলতে কিছুই ছিল না। ফলে কারখানার একটি দুর্ঘটনায় যখন ইতিকার বাবার মৃত্যু হল, তখন সংসারটা অথৈ জলে এসে পড়ল। কারখানার মালিকপক্ষের কাছ থেকে যদিও কিছু ক্ষতিপূরণ পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু সে আর কতটুকু! বছর ঘুরতে না-ঘুরতেই ভাঁড়ার শূন্য। বাধ্য হয়ে মনোরমাকেই রোজগারের উপায় খুঁজতে হল। কাজ সে পেল। না, অফিস-আদালতে চেয়ার-টেবিলে বসে কাজ নয়, রীতিমতো শারীরিক পরিশ্রমের কাজ।

বকুলতলা গ্রাম দু'টি পাড়ায় বিভক্ত। পাড়া বলতে, একটি পনেরো ফুট চওড়া পিচ রাস্তার পূর্ব ও পশ্চিম পারে খান পঞ্চাশেক বাড়ির জটলা, এই নিয়েই বড়াই, এই নিয়েই লড়াই। লড়াই বলতে রেষারেষি, সে দুর্গাপুজোর আয়োজনই হোক বা রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন, সবেতেই। সে যাই হোক, পশ্চিম পাড়ার মজুমদারদের এই গ্রামে খুব নামডাক। বাড়ির কর্তা বিপুল মজুমদার ছিলেন দাপুটে ইনস্পেক্টর। অবসর নিয়েছেন বছর দুয়েক আগে। অমন জাঁদরেল মানুষের ভিতরে যে একটা মায়া-মমতায় ঠাসা হৃদয় থাকতে পারে, মনোরমা আগে বুঝতে পারেনি। বুঝতে পারল, যখন বিপুলবাবু যেচে নিজের বাড়িতে মনোরমাকে রান্নার কাজে বহাল করলেন। কয়েক দিনের মধ্যেই আশপাশে আরও দু'টি বাড়িতে ঠিকে কাজও জুটে গেল তার। ভাগ্য ফিরল। কিন্তু মনের শান্তি তখনও উধাও।

ইতিকার স্বভাবে দুরন্তপনা যেন ভগবান খোদাই করে দিয়েছেন। আজ এর গাছের আম পেড়েছে, তো কাল ওর গাছের জামরুল— একের পর-এক অভিযোগে মনোরমার নাজেহাল অবস্থা। ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পুকুরে সাঁতার দেওয়া, স্কুল থেকে বাড়ি ফিরেই সোজা মাঠে গিয়ে হাজিরা দেওয়া... যা আর-দশটা মেয়ে পারে না, তা যেন ইতিকার নখদর্পণে। আর গ্রীষ্মের রাতে লোডশেডিং হলে তো কথাই নেই! পড়াশোনায় ইতি দিয়ে সে ছুটবে জোনাকি ধরে বোতলে পুরতে।

উচ্চমাধ্যমিক পাশ করতে না-করতেই বিয়ের পিঁড়িতে তুলে দেওয়া হয়েছিল মনোরমাকে। ফলে উচ্চশিক্ষার ইচ্ছে থাকলেও, কলেজের মুখ তার আর দেখা হয়ে ওঠেনি। মায়ের অধরা স্বপ্ন মেয়ে পূরণ করবে, এটুকুই মনোরমার চাহিদা।

"আমি কাজে চললাম। ফিরে এসে যেন দেখি সবক'টা বই পড়া হয়েছে। আমি কিন্তু পড়া ধরব।"

ইতিকা মাথা নেড়ে সায় দেয়। মনোরমা দরজার ও পাশে অদৃশ্য হতেই ইতিকার শরীরে যেন রোমাঞ্চ খেলে গেল। এই সুযোগটার জন্যই তো সে এত ক্ষণ অপেক্ষা করছিল! বিছানা থেকে নেমে সন্তর্পণে দরজায় এসে দাঁড়াল সে। বাইরে উঁকি দিয়ে দেখে নিল। নাহ, মাকে আর দেখা যাচ্ছে না। ঘণ্টা চারেকের জন্য সে নিশ্চিন্ত।

গুন গুন করে একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে গাইতে ইতিকা এখন যে ঘরটিতে এসে ঢুকল, সেটিতে আসবাব বলতে পশ্চিম দেওয়ালের গায়ে রাখা একটি খাট এবং উত্তর দেওয়ালে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড় করানো একটি পুরনো কাঠের আলমারি। ঘরটি যে বর্তমানে বিশেষ ব্যবহার হয় না, তা ঘরের বিভিন্ন অংশে জমে থাকা পুরু ধুলোর আস্তরণ দেখলেই বোঝা যায়। ইতিকার বাবা বেঁচে থাকতে ঘরটা তিনিই ব্যবহার করতেন। সে সব পুরনো স্মৃতি আগলে ঘরটি একা পড়ে আছে।

খাটের তলা থেকে একটি পুরনো টিনের ট্রাঙ্ক টেনে বের করে আনল ইতিকা। ডালা খুলে, বেশ কিছু কাপড়চোপড় সরাতেই আড়াল থেকে বেরিয়ে এল একটি পুরনো ডায়েরি। ডায়েরির উপরে লাল মলাট। রং দিয়ে কোনও এক সময়ে ফুল-পাতার ছবিও আঁকা হয়েছিল। সে সব এখন বিবর্ণ। ট্রাঙ্কের ডালা বন্ধ করে, সেটিকে পুনরায় যথাস্থানে চালান করে দিল ইতিকা। তার পর ডায়েরিটা বগলদাবা করে ফিরে এল পড়ার ঘরে।

ডায়েরির প্রথম পাতায় বেশ মোটা কালিতে লেখা, 'মনোরমা দস্তিদার'। মা'র বিয়ের আগে পদবি ছিল দস্তিদার, ইতিকা জানে। ডায়েরি যে খুব একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার, তা প্রথম প্রথম জানত না ইতিকা। ঘরের এটা-সেটা ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়ে এক দিন ডায়েরিটা আবিষ্কার
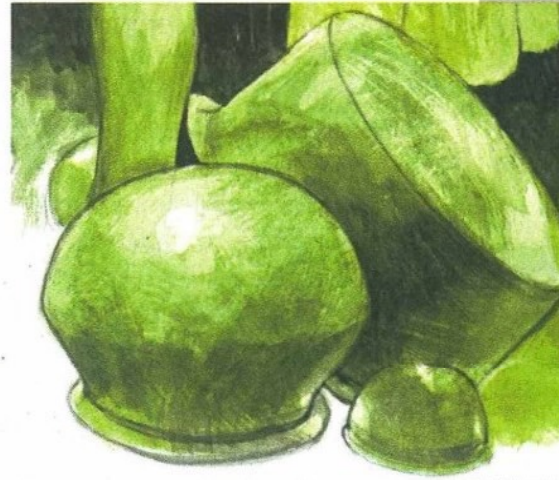
করে সে। মা'র কাছে নিয়ে যেতেই, বেশ একটা কানমলা দিয়ে মনোরমা বলেছিল, "খবরদার, আর কক্ষনও এটায় হাত দিবি না।"

তার পর ডায়েরিটা সরিয়ে দিয়েছিল কোনও এক গোপন ঠিকানায়। তখন থেকেই কৌতূহলটা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে ইতিকার মধ্যে। ডায়েরিটা খুঁজে পেতে বেশ কয়েকটি দিন ব্যয় হয়েছিল। কিন্তু ডায়েরির ভিতরের রহস্যটা উদ্ধার করতে পেরে সেই পরিশ্রমের ক্লান্তি ভুলে

গিয়ে এক অনাবিল হাসিতে ইতিকার ঠোঁট চওড়া হয়ে উঠেছিল। এখন সুযোগ পেলেই ডায়েরিটা হাতে পাওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে ইতিকা।

একটি বিশেষ পাতায় কাগজ গুঁজে রেখেছিল ইতিকা। এখন সেই পাতাটাই সে খুলল। তার পর ডায়েরির পাতায় লেখা প্রত্যেকটি শব্দ বেশ যত্ন করে টুকে ফেলতে লাগল একটি লম্বা সাদা খাতার পাতায়। মাঝে মাঝে চোখ চলে যাচ্ছে দরজার দিকে, যদি মা ফিরে আসে!

দিন সাতেক পর ব্যাপারটা চোখে পড়ল মনোরমার। ফুট দুয়েকের একটি কাঠের সিংহাসনে বিরাজমান মা লক্ষ্মীর মূর্তি এবং তার ঠিক ডান পাশের রাখা একটি মাটির ঘট। সময়ে সময়ে কিছু খুচরা পয়সা তাতে রাখে মনোরমা। ঘটের পিছনে যে অংশটা আড়ালেই থাকার কথা, সেখানে বেশ একটা বড়সড় গর্ত। বেশ কিছু পয়সা যে সেখান থেকে লোপাট হয়েছে, তা ঘটটির ভার অনুভব করেই বেশ বুঝতে পারল মনোরমা। মাথায় দপ করে আগুন জ্বলে উঠল। শেষে কিনা পয়সা চুরি!

"ইতিকা, ইতিকা," উচ্চস্বরে ডাকা ডাকি শুরু করল মনোরমা।

ইতিকা উঠোনে মাটি দিয়ে উনুন লেপছিল। মা'র বাজখাঁই গলা শুনে তার পিলে চমকে উঠল। ভয়ে ভয়ে মা'র সামনে এসে দাঁড়াল ইতিকা। তার বুক টিপ টিপ করছে। মায়ের হাতে ভাঙা ঘটটি দেখে আর কিছু বুঝতে বাকি রইল না ইতিকার।

"লক্ষ্মীর ঘট থেকে তুই পয়সা চুরি করেছিস?"

মাথা নিচু করে অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে রইল ইতিকা।

"পয়সাগুলো দিয়ে কী করেছিস? সত্যি করে বল?"

ইতিকা জবাব দিল না। এর পর ঠিক কী ঘটতে চলেছে, তা আন্দাজ করতে পেরেছিল ইতিকা। ঘটলও তাই। রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে মেয়ের গালে একটি জোড়ালো চড় বসিয়ে দিল মনোরমা। ইতিকার গাল বেয়ে নোনা জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

এই ঘটনার মাস চারেক পর এক রবিবার। মজুমদার-বাড়ির রান্নাঘরে মনোরমা ব্যস্ত খুন্তি নাড়তে এবং মজুমদার-গিন্নি তদারকিতে। অবসর জীবনে যদিও রবি-সোমের ফারাক করা যায় না, তথাপি পুরনো রেওয়াজ মেনে রবিবারে এই বাড়ির মেনুতে বিশেষ আয়োজন থাকবেই। যেমন, আজকের মূল আকর্ষণ হল কচি পাঁঠার ঝোল।

ঘড়িতে সকাল দশটা। বিপুলবাবু হাঁক পাড়লেন, "মনোরমা, এক কাপ দারুণ করে চা বানিয়ে নিয়ে এসো তো, দেখি।"

দিন সাতেক পর ব্যাপারটা চোখে পড়ল মনোরমার। ফুট দুয়েকের একটি কাঠের সিংহাসনে বিরাজমান মা লক্ষ্মীর মূর্তি এবং তার ঠিক ডান পাশের রাখা একটি মাটির ঘট। সময়ে সময়ে কিছু খুচরা পয়সা তাতে রাখে মনোরমা। ঘটের পিছনে যে অংশটা আড়ালেই থাকার কথা, সেখানে বেশ একটা বড়সড় গর্ত।

আরামকেদারায় বসে বিপুলবাবু। পা-জোড়া একটি বেতের মোড়ার উপর বর্ধিত, চোখের সামনে মেলে ধরা খবরের কাগজ। খবরের কাগজে রবিবারের বিশেষ পাতায় দু'টি করে গল্প প্রকাশিত হয়। তারই একটি খুব মন দিয়ে পড়ছিলেন বিপুলবাবু। মনোরমা চায়ের কাপ টেবিলে নামিয়ে রেখে চলে যাচ্ছিল, বিপুলবাবু অতর্কিতে বললেন, "আহা, কত দিন বাদে এমন একটি উচ্চমার্গের গল্প পড়লাম! একেই বলে সোনার কলম। লেখিকার নামখানা একেবারে তোমার নামে, মনোরমা বর্মন।"

নামটা শুনে চমকে উঠে থমকে দাঁড়াল মনোরমা। বিপুলবাবুর কাঁধের উপর দিয়ে উঁকি দিল সে। টান টান করে ধরে রাখা কাগজখানায় মোটা কালো অক্ষরে লেখা গল্পের নাম, 'বিষাদ যাপন'। বুকটা ধক করে উঠল মনোরমার।

"দাদাবাবু, পেপারটা এক বার দেখতে পারি?"

মনোরমার কথা শুনে যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেলেন বিপুলবাবু। খবরের কাগজটা মনোরমার হাতে তুলে দিতে দিতে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি পড়তে জানো?"

মনোরমা সে প্রশ্নের উত্তর দিল না। গল্পের প্রথম তিনটে লাইনের উপর চোখ বোলাতেই সবটাই তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। চোখ দুটো ভিজে উঠেছে। এখন একটি আড়াল প্রয়োজন। খবরের কাগজটা ফিরিয়ে দিয়ে দৌড়ে রান্নাঘরে চলে গেল মনোরমা। তেল-মশলার ঝাঁঝের সঙ্গে দু'-এক ফোঁটা চোখের জল গড়ালে কে টের পাবে!

"আজ খবরের কাগজে আমার লেখা গল্প বেরিয়েছে, জানিস?"

ভূগোল বই পড়ছিল ইতিকা। উজ্জ্বল দৃষ্টি নিয়ে মায়ের মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাল সে। সব হিসেব মিলে গেছে মনোরমার। ছুটে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল ইতিকা।

"আমার ডায়েরির গল্প খবরের কাগজে তুই পাঠিয়েছিস, তাই তো?"

ইতিকা মৃদু মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বলল।

"আর, লক্ষ্মীর ঘটটা ভেঙেছিলি কেন?" মনোরমা জিজ্ঞেস করল।

"বা রে, খবরের কাগজে গল্প পাঠানোর জন্য ভাল খাম, ডাকটিকিট এ সব কিনতে টাকা লাগবে না!" কথাগুলো বলেই মায়ের বুকে মুখ গুঁজে দিল ইতিকা। তার পর মৃদু স্বরে বলল, "তুমি যে এত ভাল গল্প লিখতে পারো, ডায়েরিটা না পড়লে কী করে জানতাম! জানো মা, বিপুলজেঠুর কাছে শুনেছি, খবরের কাগজে নাকি গল্প বেরোলে টাকাও দেয়! এই গল্পটার জন্য তোমাকেও যখন টাকা দেবে, তুমি তোমার জন্য একটা সুন্দর ফুলছাপ দেওয়া শাড়ি কিনবে। তোমার এই সাদা সাদা শাড়ি আমার একদম ভাল লাগে না।"

মেয়েকে দু'হাতে জাপটে বুকে জড়িয়ে ধরল মনোরমা। ফোঁটা ফোঁটা চোখের জল স্নেহবর্ষণের মতো ইতিকার মাথায় ঝরে পড়তে লাগল।

ছবি: প্রসেনজিৎ নাথ

১		■	■	২	৩		৪
	■	৫		■		■	
৬	৭		■	৮	■	৯	
■	১০		১১		■	১২	
১৩		■	১৪		১৫		■
১৬		■		■	১৭		১৮
	■	১৯	■	২০		■	
২১				■	■	২২	
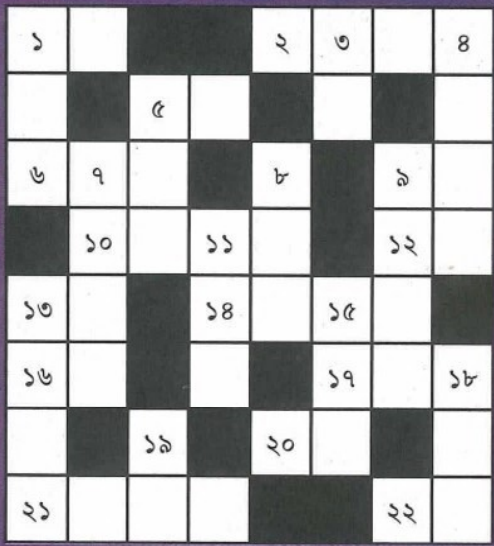
পাশাপাশি

১। শিব।
২। একটি ঠাট।
৫। নদীর বুকে জেগে ওঠা একটি ভূখণ্ড।
৬। কোমল।
৯। বকুনি।
১০। ব্যাঙের ডাক।
১২। সাত... হার।
১৩। যা জমিয়ে রাবড়ি হয়।
১৪। আওয়াজ।
১৬। লক্ষ্মীর অন্য নাম।
১৭। সীতার পিতা।
২০। চাল যা থেকে হয়।
২১। রসালো সাদা মিষ্টি।
২২। মাছ ধরার জন্য বঁড়শির আগায় যা ব্যবহৃত হয়।

উপর-নীচ

১। হত্যা, বধ।
৩। লজ্জা।
৪। গানের লয় নিয়ে বৈচিত্র প্রদর্শন।
৫। বিস্ময়।
৭। জাঁকজমক।
৮। গাছের ছাল।
৯। চাকা যে ভাবে ঘোরে।
১১। গঙ্গার বাহন।
১৩। শুকনো পাতা উড়ে যাওয়ার আওয়াজ।
১৫। পাইন গাছের আঠা।
১৮। এক জন অতীন্দ্রিয় কবি ও সাধক।
১৯। ডাকার জন্য এই সম্বোধনটি ব্যবহার করা হয়।

গত সংখ্যার সমাধান

র	■	■	ভা	র	বি	■	দা
ম	ল	ম	ল	■	র	জ	ন
ণী	■	র	■	ল	তি	■	ধ্যা
■	দ	ম	ক	ল	■	কা	ন
ব	ল	■	দা	না	পা	নি	■
ন	■	স	চ	■	গ	■	অ
ব	দ	র	■	গো	ল	মা	ল
ন	■	ব	জ	রা	■	■	ক

শালুক

কাগজের ভিনগ্রহী

নিজের হাতে

উপকরণ: কমলা, কালো, সাদা ও সবুজ রঙের অরিগ্যামি কাগজ, কম্পাস, পেনসিল, কাঁচি ও আঠা।

কী ভাবে করবে:

১। প্রথমে কমলা রঙের কাগজ থেকে ছবি দেখে অনেকটা ত্রিভুজের মতো দেখতে, এমন একটা আকার কেটে নাও। আর কেটে নাও দুটো ছোট ছোট শিংয়ের মতো টুকরো।

২। এ বার কালো কাগজটা নাও। ছবি দেখে কেটে ফ্যালো পা, পেট আর চোখের জন্য এক-একটা করে আকার।

৩। এর পর সাদা আর সবুজ কাগজ থেকে দরকার মতো সেই সব আকার কেটে নাও, যেগুলো ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

৪। কাটাকুটির পর এ বার জোড়া। সাদা কাগজের উপর আঠা দিয়ে ছবি দেখে একে একে জুড়ে নাও চোখ, মাথার শিং, পা, পেটের জায়গা। দ্যাখো তো, হুবহু এক দেখতে লাগছে কি না! ব্যস, তা হলেই তোমার কাগজের ভিনগ্রহী তৈরি!

বৈশালী সরকার

কাগজের ভিনগ্রহীর উপকরণ

কাগজের ভিনগ্রহী

ফারাক পাও

২টি ছবিতে অন্তত ৮টি অমিল রয়েছে। প্রথমে নিজেরা খুঁজে বের করো। তার পর আগামী সংখ্যায় দেওয়া উত্তরের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ো।
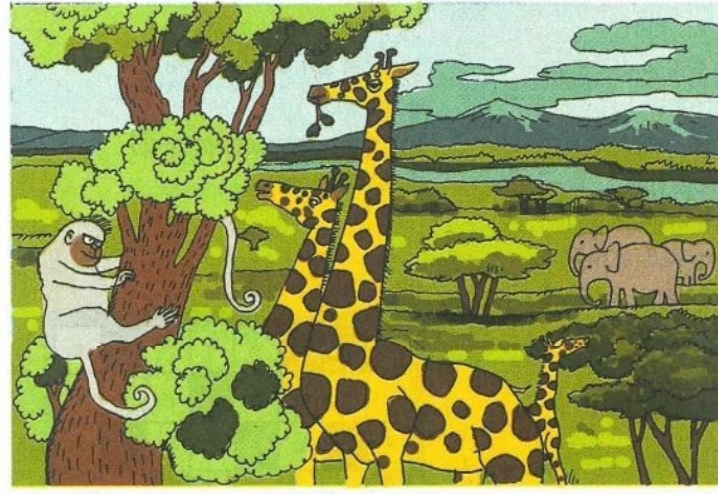
ছবি : প্রসেনজিৎ নাথ
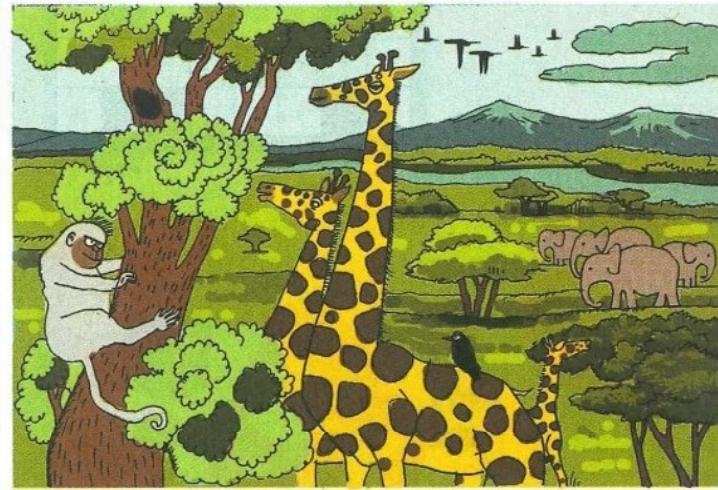
উত্তর: ২০ অগস্ট সংখ্যায়

গত সংখ্যার উত্তর

১। বিড়ালটার পিঠে ব্যাগ এসেছে।
২। আকাশে একটা পাখি কমে গেছে।
৩। একটা ডলফিন কমে গেছে।
৪। বিড়ালটার ল্যাজ ছোট হয়েছে।
৫। কুকুর বন্ধুটির কান দুটো ছোট হয়েছে।
৬। বিড়ালটার উড়ন্ত টুপি নেই।
৭। সুটকেসে দুটো পাখি আঁকা হয়েছে।
৮। একটা ব্যাগ কমে গেছে নৌকার উপর থেকে।

সুদোকু

৪				১				২
১		৫		২		৭		৪
	৯		৮		৪		৫	
	১			৪			৭	
			৭		৫			
	৬			৯			৪	
	৫		৪		৬		২	
৭		৮		৩		৫		৬
৬				৫				৯

এখানে ৯টি ঘরের একটি বর্গক্ষেত্রে ১ থেকে ৯-এর মধ্যে কিছু সংখ্যা বসানো আছে। ফাঁকা ঘরগুলোয় তোমাদের বাকি সংখ্যা এমন ভাবে বসাতে হবে, যাতে পাশাপাশি এবং উপর-নীচে কোনও লাইনে, এমনকি, ছোট-ছোট বর্গক্ষেত্রগুলোর মধ্যে ১ থেকে ৯-এর মধ্যে কোনও সংখ্যা যেন দু'বার না বসে!

৬	৯	৫	৭	১	৪	৮	২	৩
১	৩	২	৬	৫	৮	৪	৯	৭
৪	৮	৭	৯	৩	২	৫	১	৬
৩	৭	৪	৫	৯	৬	১	৮	২
৯	৫	৬	২	৮	১	৭	৩	৪
২	১	৮	৩	৪	৭	৯	৬	৫
৮	৬	৩	১	৭	৫	২	৪	৯
৭	২	১	৪	৬	৯	৩	৫	৮
৫	৪	৯	৮	২	৩	৬	৭	১

চিরকালের সেরা

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখার সঙ্গে তোমরা আশা করি সকলেই পরিচিত। কার সঙ্গে যে তুলনা করা যায় এই লেখনীর! শরৎকালের তুলো মেঘের আকাশ নাকি গাঢ় নীল একটা নির্জন সমুদ্রতটের সঙ্গে? কথাগুলো কি অদ্ভুত? আসলে অবন ঠাকুরের লেখার শৈলীটাই যে এমন অলৌকিক সুন্দর। সাধারণ কিছু চেনা উপমাতে ধরা যায় না তাঁর লেখার আত্মাকে। মুখবন্ধে আছে, 'পুরাণ থেকে, ইতিহাস থেকে, কিংবা কখনো দেশ-বিদেশের খ্যাত-অখ্যাত কোনো রচনা থেকে সূত্র নিয়ে কথা বুনে যান তিনি আপনমনে।' ক্ষীরের পুতুল, শকুন্তলা, বুড়ো আংলা, ভূতপতরির দেশ, খাতাঞ্চির খাতা—তোমরা সকলেই হয়তো এই বই ছোট্ট থেকে পড়ে আসছও, ভালবাসছও। কিন্তু কিছুতেই হয়তো বইটাকে পুরো পড়েও যেন শেষ করতে পারছ না। এতটাই অফুরন্ত ভাল লাগার মহিমা। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই কালজয়ী বইগুলোকেই এই দৃষ্টিনন্দন বইয়ে একত্রিত করা হয়েছে। তোমরা যারা এই বইগুলো আলাদা ভাবে পড়োনি, তাদের কথা ভেবেই। তবে বইয়ে শুধু অবন ঠাকুরের লেখাই নয়, পাতায় পাতায় আছে দেবব্রত ঘোষের অপূর্ব সব অলঙ্করণ। আর বইয়ের শুরুতেই আছে শঙ্খ ঘোষের একটি অনবদ্য ভূমিকা। সেখানে তিনি অবন ঠাকুর প্রসঙ্গে লিখেছেন—*একেবারে যে নিজের ইচ্ছেতেই তিনি কলম ধরেছিলেন, তা নয়। লেখার দায়িত্ব তুলে নিয়েছিলেন তাঁর প্রিয় পিতৃব্য রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছেয়।...রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: 'যেমন করে তুমি গল্প কর, তেমনি করেই লেখো।'* এই আটপৌরে বৈঠকী মেজাজেই আজীবন লিখে গেছেন অবন ঠাকুর। তাঁর সেই অতুলনীয় শৈলী বা চকমিলানো গল্পের ভাণ্ডার বাংলার ছেলেমেয়েদের কাছে আজও এক অমূল্য 'বর্মিবাক্স'। বহু শতক পেরিয়েও যার বিস্ময় অটুট, যার অক্ষরের সিঁড়ি বেয়ে অনায়াসে নেমে যাওয়া যায় এক আশ্চর্য মেঘ ও রৌদ্রের দেশে। যে দেশ ছেলেবেলার চিরকালের সুরে ভাসছে— 'আগমনীর সুর, ফিরে আসার সুর, বুকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ার সুর, কোলে এসে গলা ধরার সুর, আকাশ দিয়ে ছুটে আসছে, বাতাস দিয়ে ছুটে আসছে, খোলা-দুয়ারে উঁকি মারছে, খালি ঘরে সাড়া দিচ্ছে...'

নিজের জন্য নিজের বাঁচা

তিতির এখন মোটে ক্লাস সেভেন। তার একটা সমস্যা হয়েছে। কিচ্ছু খেতে চাইছে না ইদানীং। কেন? ওর মনে হচ্ছে, ও খুব মোটা হয়ে গেছে। সেটা হয়তো ভুল নয়, কিন্তু গেনুটা এমন পাজি, ওকে দিন-রাত মোটা বলে তো খ্যাপায়ই, হস্তিসুন্দরী, কুমড়োপটাশ ইত্যাদিও বলে থাকে। এগুলো তো আর ভুল নয়! সে দিন সুকুমার রচনাবলিটা ওল্টাতে গিয়ে কুমড়োপটাশের ছবিটা দেখতে পেয়ে খুব উদাস হয়ে গেছিল। হুঁশ হল যখন, তখন আধ কৌটো চানাচুর শেষ হয়ে গেছে। তখন তো ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে। তার পর থেকে ও এখন আইসক্রিমের গাড়ি দেখে প্রায় চোঁ চাঁ দৌড় মারছে। আর চাউমিন, চিলি চিকেন, চিকেন প্যাটি এ সব ক'দিন আগেই ছিল জীবনে... কিন্তু এখন তো মনে হচ্ছে গত জন্মের!

না না, এটা কিন্তু সমস্যার সমাধান নয়। প্রথমত তোমায় বুঝতে হবে, তুমি কেন এবং কার জন্য বাঁচছ? মোটা হয়ে যাওয়াটা তোমার পক্ষে বিপজ্জনক ঠিকই। কিন্তু সেটা কারও খ্যাপানোর জন্য নয়। গেনু এ বার খ্যাপাতে এলে তুমি মোটেও পাত্তা দেবে না। ওর সঙ্গে মারামারি করতে হবে না। কিন্তু কাউকে কিছুতে পাত্তা না দিলে একটা সময়ের পর সে উৎসাহ হারিয়ে ফেলতে বাধ্য। খেতে তো হবেই। রোজ রোজ প্রিয় খাবার থেকে সরে থাকলে তুমি শিগগিরই স্থায়ী মন খারাপ বা ডিপ্রেশনের শিকার হয়ে যাবে। তখন অন্য বিপদ। তবে আসল কথাটা জেনো, তোমার নিজের স্বার্থেই তোমায় রোগা হতে হবে। সেটা নিয়ম মেনে। সকালে হেঁটে, জিমে বা যোগব্যায়াম কেন্দ্রে যোগদান করে ও সেই সঙ্গে ডায়েটিশিয়ানকে দেখিয়ে তোমার দেহগড়ন ও প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দিষ্ট চার্ট মেনে রোগা হওয়াটাই নিয়ম। ভাজাভুজি বা মিষ্টি কম খেয়ে স্বাস্থ্যকর খাবার খেলে কাজ হবেই। তবে হ্যাঁ, হাতে-নাতে নয়। ধৈর্য ধরতে হবে। খুব সহজ হল, সকালে জোরে ছুটে আর বার বার অল্প অল্প করে খেয়ে কিছু দিন দ্যাখোই না। আয়নার ভিতরের মোটা ছবিটাকে রোগা আর গেনুলালকে জব্দ করা যায় কি না!

সুদেষ্ণা ঘোষ
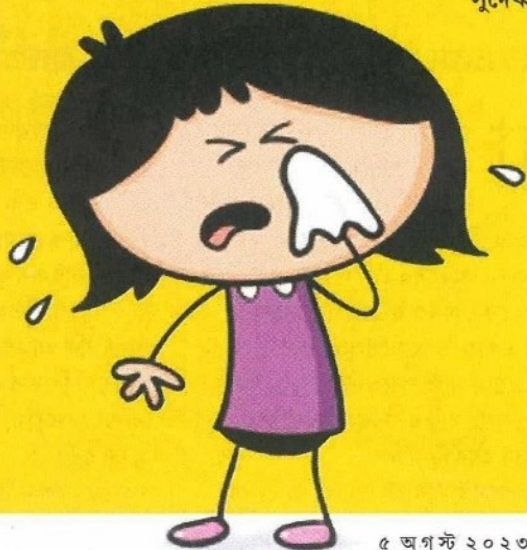
রাজপ্রাসাদ

ব্রাসেলস ভ্রমণ

ব্রাসেলস শহরের টিনটিন মিউজ়িয়াম, রাজপ্রাসাদ, চকলেট বুটিক ঘুরে লিখেছেন **বিদিশা বাগচী**

ব্রাসেলস যে শুধু বেলজিয়ামের বা ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাজধানী, তা নয়। অনেক সুন্দর ও মজার জিনিস আছে এই শহরে, যা যে-কোনও বয়সের মানুষকে আনন্দ দিতে পারে। যে-কোনও ইউরোপীয় শহরের মতো এখানেও রাজপ্রাসাদ, ক্যাথিড্রাল, মিউজ়িয়াম সবই আছে। তার সঙ্গে আছে আরও দুটো দারুণ জিনিস, বেলজিয়ান চকলেট আর টিনটিন।

গ্র্যান্ড প্লেস ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট— শহরের সবচেয়ে বড় প্লাজ়া। আমাদের হোটেলটা এর খুব কাছেই ছিল তাই রোজই এক বার সেখানে যাওয়া হত। প্রচুর লোক সেখানে ঘোরা-ফেরা করছে কিংবা নির্দ্বিধায় ফুটপাতে বসে হয় ফ্রেঞ্চ ফ্রাই না হয় আইসক্রিম খাচ্ছে। তাদের দেখাদেখি আমরাও ফুটপাতে বসে অবাক হয়ে চার দিকের কারুকার্য করা বড় বড় বিল্ডিং দেখতাম, বিশেষ করে ব্রাসেলস টাউন হল।

শহরের বেশ নামী একটা দর্শনীয় জিনিস হল ম্যানেকিন পিস ফোয়ারা— একটা বাচ্চা ছেলের স্ট্যাচু। হাজার লোক ভিড় করে তা-ই দ্যাখে। ওই ২ ফুটের ব্রোঞ্জের ফোয়ারা এখন ব্রাসেলস শহরের বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে। এক দিন গ্র্যান্ড প্লেস থেকে ওই স্ট্যাচু দেখতে যাওয়ার পথেই দেখা হল টিনটিনের সঙ্গে— একটা বুটিক, টিনটিন বুটিক। সেখানে খুব সুন্দর একটা জিনিস চোখে পড়ল। অনেক বছর আগে টিনটিনের সৃষ্টিকর্তা অ্যার্জে একটা কাল্পনিক 'টিনটিন মিউজ়িয়াম'-এর নকশা

সারা শহর ঘুরে চারটে দোকানে ৫-৬ রকম চকলেট টেস্ট করা হল। প্রথম প্রথম বেশ মজা লাগছিল, কিন্তু পরে মনে হচ্ছিল এত মিষ্টি ভাল লাগছে না। বরং পরেরটা আমার দারুণ লাগল! প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে বেলজিয়ামের দুই বিখ্যাত ধরনের চকলেট, প্রালাইন (নানা রকমের পুর ভরা গোল গোল চকলেট) আর মেন্দিয়ান্ত (নানা রকমের ড্রাই ফ্রুট দিয়ে চকলেট চাকতি) বানানো শিখলাম। ক্লাস চলাকালীন সবাইকে এক কাপ করে হট চকলেট দেওয়া হল। আমরা ছাত্র-ছাত্রীর দল উৎফুল্ল হয়ে সেই কাপে চুমুক দিতে দিতে, আগ্রহ ভরে চকলেট বানানো শিখলাম। ক্লাস শেষ হওয়ার পর সবাই এক বাক্স করে চকলেট উপহারও পেলাম।

সারা শহর জুড়ে নানা জায়গায় রঙিন ও সাদা-কালোয় টিনটিন মুরাল আছে। নানা গল্প থেকে নেওয়া নানা দৃশ্য। কোনওটা অ্যার্জের নিজের আঁকা, কোনওটা তাঁর স্টুডিয়োর অন্য শিল্পীদের। এক দিন সেই আঁকা সারা শহর ঘুরে ঘুরে দেখলাম।

সেন্ট মাইকেল ও সেন্ট গুডুলা ছিলেন ব্রাসেলস শহরকে সুরক্ষিত রাখার জন্য দুই সন্ত। এক দিন সকালে তাঁদের নামে ক্যাথিড্রাল দেখতে গেলাম। প্রায় তিনশো ফুট উঁচু এই গির্জার দুই টাওয়ার। ভিতরে ঢুকে চোখে পড়ল বিশাল অন্দরমহল। দু'দিকে বড় বড় থাম আর তাতে অসাধারণ সুন্দর সব ব্রোঞ্জের মূর্তি। সবচেয়ে চোখে পড়ার মতো সুন্দর অবশ্য প্রার্থনাবেদির নীচে আদম আর ইভের মূর্তি। এ ছাড়াও আছে দামি আসবাবপত্র ও দুর্ধর্ষ সব রঙিন কাচে আঁকা চিত্র।

ব্রাসেলসের কমিক স্ট্রিপ সেন্টার কিন্তু টুরিস্টদের কাছে বেশ জনপ্রিয়। কিছু স্থায়ী এবং অস্থায়ী প্রদর্শনী চলতেই থাকে এখানে। এ ছাড়া আছে একটা দারুণ লাইব্রেরি, যেখানে কমিক স্ট্রিপের সমস্ত ইতিহাস জানা যায়। কবে কোনটা আঁকা হয়েছিল থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু, খুব বিস্তারিত ভাবে।

সপ্তাহের কোনও কোনও দিন ব্রাসেলসের রাজপ্রাসাদে টুরিস্টদের ঢুকতে দেওয়া হয়। আমরা যে দিন গেলাম, সে দিন ঢোকার দিন ছিল না। তাই বাইরে দাঁড়িয়েই অনেক ফটো তুলে ফিরে গেলাম। রাজপ্রাসাদের কাছেই মঁ দেজ়া বা মাউন্টেন অফ আর্টস। একদম

গ্র্যান্ড প্লেস

করেছিলেন। তারই রূপান্তর ওই বুটিকে দেখলাম। ভিতরে নানান ভাষায় বই, পুতুল, টি-শার্ট... আরও অনেক কিছু। ম্যানেকিন পিস দেখে ফেরার পথে ঢুকলাম লিওনিডাস চকলেট বুটিকে। একদম একশো শতাংশ খাঁটি কোকো দিয়ে বানানো এই চকলেট খুব মসৃণ, মুখে কোনও দানা ভাব থাকে না। দোকানের ভিতরে ঢুকে প্রায় মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার জোগাড়! কোনটা ছেড়ে কোনটা কিনি? বেশ কিছু ইউরো খরচ করে কয়েক বাক্স কিনে দোকান থেকে বেরোনো হল।

সুইৎজ়ারল্যান্ডে যেমন চকলেট ফ্যাক্টরি টুরে যাওয়া যায়, এখানে চকলেট টেস্টিং ও বানানোর ক্লাস, দুটোই করা যায়। বয়সের কোনও বাধা নেই। সময় করে দুটোতেই নাম লিখিয়ে ভিড়ে পড়লাম। প্রথমটায়,

মুরাল

চকলেটের লোভনীয় সম্ভার

শহরের মাঝখানে এই স্কোয়্যারে আছে রাজকীয় গ্রন্থাগার ও জাতীয় সংরক্ষণাগার ও কিছু সরকারি অফিস। গ্রন্থাগারের সামনেই রাজা প্রথম আলব্যার্টের ঘোড়ায় চড়া মূর্তি। রাজার পছন্দের একটা স্লোপ গার্ডেনও আছে, নানা রকম গাছ দিয়ে সাজানো, একটু উপর থেকে দারুণ ভিউ। অনেকের কাছেই অ্যাটোমিয়ামের গল্প শুনেছিলাম। এক দিন হাতে একটু সময় থাকায় ঠিক করলাম, ওখানেই যাব। সেই দিনটা বোধ হয় ছিল আমার অবাক হওয়ার দিন। প্রথমে দেখে একটা স্পেসশিপ মনে হলেও, অ্যাটোমিয়ামে একটা পরমাণুকে একশো পঁয়ষট্টি বিলিয়ন গুণ বড় করলে কেমন দেখাবে, এ সব দেখে চমকে গেছিলাম। সব মিলিয়ে ন'টা গোলক আছে। লিফটে করে উপরে উঠে সারা শহর দেখলাম।

এই অ্যাটোমিয়াম নিয়ে বেশ একটা মজার ঘটনা আছে। ১৯৫৮ সালে ব্রাসেলস ওয়ার্ল্ড ফেয়ারে এই তিনশো পঁয়ত্রিশ ফুট উঁচু অ্যাটোমিয়াম প্রথম প্রদর্শিত হয়। তখন কথা ছিল, ছ'মাস পরে এটা ভেঙে ফেলা হবে। কিন্তু দেখা গেল এটা এত জনপ্রিয় হয়ে গেছে যে, সেই ওয়ার্ল্ড ফেয়ারের কর্তৃপক্ষ এটা রেখেই দিল। এখন ব্রাসেলস বেড়াতে গিয়ে এটা না দেখলে বেড়ানো অসম্পূর্ণ রয়ে যায়।

শহর থেকে ঘণ্টা খানেকের ট্রেন রাইড নিলেই লুভা লা নিউভ শহরে 'অ্যার্জে মিউজ়িয়াম'। প্রতি মাসের প্রথম রবিবার এই মিউজ়িয়ামে ঢুকতে কোনও টিকিট লাগে না। তার মানে প্রচুর ভিড়। তাই আমরা ওই রবিবার বাদ দিয়ে সপ্তাহের মাঝখানে গেলাম। বিল্ডিংয়ের ভিতরে লিফটের সামনেই একটা ছোট কার্পেট, দুই মজাদার ডিটেকটিভের টুপি হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে। দেখে যেমন হাসি পেল, তেমনই মনটা আনন্দে ভরে গেল। টিকিট কাউন্টারে টিকিটের সঙ্গে চাইলে অডিয়ো গাইডও নেওয়া যায়। মিউজ়িয়ামে নানা জিনিস প্রদর্শন করা আছে। বই, ছবি, গল্পে দেখানো অনেক জিনিসের মডেল, যেমন ক্যালকুলাসের বানানো সাবমেরিন, আরুম্বায়ার মূর্তি ইত্যাদি, খবরের কাগজের কাটিং... আরও অনেক কিছু। যে টেবিলে বসে অ্যার্জে ছবি আঁকতেন বা কাজ করতেন সেই টেবিলটাও আছে, তার সঙ্গে ওই টেবিলেরই একটা মডেলও রাখা আছে। সেইখানেই অন্য কয়েকটা ভাষার সঙ্গে ভারতীয় ভাষার বই সাজানো। তার পর আছে এক প্রদর্শন ঘর, যেখানে ভারত সমেত পৃথিবীর সমস্ত ভাষায় প্রকাশিত টিনটিনের বই সাজানো আছে।

ঘণ্টা খানেক ধরে মিউজ়িয়াম ঘুরে বুঝলাম, বেজায় খিদে পেয়েছে। গিয়ে ঢুকলাম মিউজ়িয়ামের 'ল পেতি ভ্যাঁতিয়েম' রেস্তরাঁয়। বাইরের লনে 'আশ্চর্য উল্কা' গল্পে দেখা বেশ বড় সেই সাদা ও লাল রঙের মাশরুম শোভা পাচ্ছিল। খেতে বসে দেখলাম, টেবিল ম্যাটগুলো সব টিনটিনের গল্পের কোনও না-কোনও দৃশ্য, বেশ মজার। রেস্তরাঁটা কিন্তু সাজানোও *ল পেতি ভ্যাঁতিয়েম* পত্রিকার ছবি দিয়ে।

এ বার ফেরার পালা। মিউজ়িয়ামের ঠিকানাটা কিন্তু খুব মজার! '২৬ রু দু ল্যাব্রাডর'— বইয়ে যা ছিল আসলে টিনটিনের বাড়ি।

ফটো: লেখক

মঁ দে

শিল্পীর কল্পনায় দুই ভয়েজার
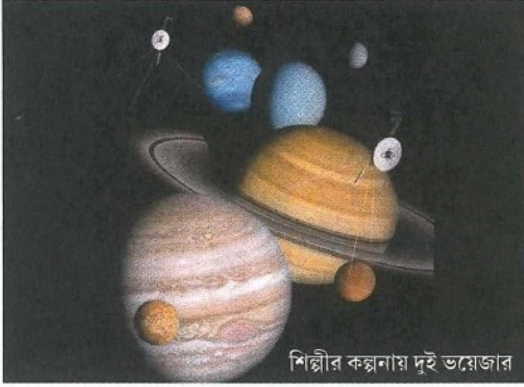
কোথায় ভয়েজার টু?

মার্কিন মহাকাশ গবেষণাকেন্দ্র নাসা ১৯৭৭ সালে মহাকাশে পাঠিয়েছিল দু'টি যান, ভয়েজার ওয়ান এবং ভয়েজার টু। পরিকল্পনা ছিল, সৌরজগতের সীমানা ছাড়িয়ে ওরা দু'জন ক্রমাগত আরও দূরে উড়ে যাবে। যেতে যেতে সমানে পৃথিবীতে জানাতে থাকবে নিজেদের ভ্রমণকাহিনির অনুপুঙ্খ বিবরণ। ৪৬ বছর পর, মহাকাশ অভিযানের হাজারও বিপদ এড়িয়ে, আজও ওরা উড়েই চলেছে। সৌরজগতের সীমানা ছাড়িয়ে বেরিয়ে পড়েছে কবেই, তবু ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়নি কেউ। সম্প্রতি যান্ত্রিক এক ত্রুটির কারণে ভয়েজার টু-এর অ্যান্টেনার মুখ সামান্য ঘুরে গেছে। বিচ্ছিন্ন হয়েছে পৃথিবীর সঙ্গে তার যোগাযোগ। নাসা যদিও উদ্বিগ্ন নয়। তারা নিশ্চিত, আগামী অক্টোবরেই ফের এই যোগাযোগ স্থাপন করা যাবে।

সেই গোলকৃমিদের এক জন

কুম্ভকর্ণ কৃমি

ছেচল্লিশ হাজার বছর আগে যখন এই গ্রহে ঘুরে বেড়াত লোমশ ম্যামথ, সেই সময় পৃথিবীতে ছিল গোলকৃমিরাও (রাউন্ড ওয়ার্ম)। এত বছর পর বরফের ভিতর থেকে উদ্ধার করা গেছে ওই সময়ের এক জোড়া গোলকৃমিকে, যারা তখনও মরেনি! কুম্ভকর্ণের ঘুমকে হার মানিয়ে বরফের মধ্যে ওরা ছিল এক রকম সুপ্ত অবস্থায়, যে দশার নাম বিজ্ঞানীরা দিয়েছেন 'ক্রিপ্টোবায়োসিস'। বরফ থেকে সরিয়ে কৃমি দুটোকে জলে ফেলতেই ঘুম ভেঙে ওরা জেগে উঠেছে। ভবিষ্যতে লম্বা মহাকাশ সফরে মহাকাশচারীদের এমন দীর্ঘ সুপ্ত দশায় রাখা খুব দরকার। বিজ্ঞানীরা তাই ক্রিপ্টোবায়োসিসের খুঁটিনাটি জানতে চান। সেই কৌতূহল নিরসনে এই আবিষ্কার অবশ্যই উৎসাহব্যঞ্জক।

নতুন ডায়নোসর

২০১২ সালে তাইল্যান্ডে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল এক ডায়নোসরের দেহাবশেষ। এত বছর ধরে পরীক্ষার পর সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত হয়েছেন, এই ডায়নোসরটি নতুন। চার হাত-পায়ের তৃণভোজী এই ডায়নোসর পৃথিবীর বুকে দু'পায়ে হেঁটে বেড়াত প্রায় পনেরো কোটি বছর আগে। পূর্ণবয়স্ক এই ডায়নোসরের দেহ আর লেজ, দুয়ে মিলে এই প্রাণী ছিল লম্বায় প্রায় দুশো মিটার। এর নাম বিজ্ঞানীরা দিয়েছেন, মিনিমোকার্সর ফুনোয়েন্সিস। তাইল্যান্ডের যেখানে মিনিমো-কে খুঁজে পাওয়া গেছে, তার আশপাশে অবিকল ওর মতো আরও অনেক ডায়নোসরেরই জীবাশ্ম পাওয়া গেছে। যা থেকে বোঝা যায়, পনেরো কোটি বছর আগে ওই এলাকায় এই রকম ডায়নোসর ছিল ভূরি ভূরি।

শিল্পীর কল্পনায় মিনিমোকার্সর

বিশ্ব জুড়ে বিজ্ঞানের নানা শাখায় নিরন্তর ঘটে চলেছে নানা ঘটনা। তারই কিছু খবর রইল এই পাতায়।

পাহাড়ের পাথরে জল

হিমালয়ের ক্রিস্টালাইন ম্যাগনেসাইট পাথরে বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি খুঁজে পেয়েছেন প্রাগৈতিহাসিক মহাসমুদ্র ও নদীর জলের ফোঁটা। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, ওই জলবিন্দু আজ থেকে প্রায় ৫০-৬০ কোটি বছর আগেকার। তার ঠিক আগে দীর্ঘ কাল বরফে ঢাকা ছিল আমাদের গ্রহ। ওই সময় নাগাদই বরফ গলে জলে ভরে যায় সারা গ্রহ। তার পর পৃথিবীর মহাসমুদ্র এবং বাতাসে ক্রমে বাড়তে থাকে অক্সিজেন। কিন্তু এত প্রাচীন আমলের জীবাশ্ম বা সমুদ্র কিছুই আজ আর নেই বলে, ওই সময়টা সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা তেমন কিছু জানতেন না। এ বার ভারত ও জাপানের বিজ্ঞানীরা এই জলবিন্দু খুঁজে পাওয়ায় আশা করা যাচ্ছে, পৃথিবীর ইতিহাসের রহস্যাবৃত ওই সময়টা এবং তার পরেই পৃথিবীতে অক্সিজেনের বাড়বাড়ন্তের নেপথ্য কারণ সম্পর্কে আরও জানা যাবে।

উপরে সেই মাটি, তলায় তার মধ্যে জলবিন্দু

অচ্যুত দাস

আয়ারল্যান্ড সফরে নেতৃত্ব দেবেন বুমরা

বুমরার প্রত্যাবর্তন

চোট-আঘাত সারিয়ে ফিরছেন যশপ্রীত বুমরা, তাও আবার অধিনায়ক হয়ে। লিখেছেন

মধুরিমা সিংহ রায়

জোরে বোলারদের জীবনে চোট-আঘাত অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, এ কথা সকলেই জানেন। চোটের কারণে ব্রেট লি থেকে শেন বন্ড... কত জন যে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ বা টুর্নামেন্ট থেকে দূরে থাকতে বাধ্য হয়েছেন, তার আর ইয়ত্তা নেই। যশপ্রীত বুমরাও সেই গোত্রেরই মানুষ। কত বার যে ছিটকে গিয়েছেন, আর কত বার ফিরে এসেছেন... এ বারেও তিনি ফিরলেন। বেশ ক'মাস মাঠের বাইরে থাকার পর ঠিক 'বুমরাচিত' কামব্যাক হল তাঁর। আয়ারল্যান্ড সফরে নেতৃত্ব দেবেন তিনি। আমাদের দেশে যাঁরা অধিনায়ক হয়েছেন, তাঁরা তো প্রায় সকলেই ব্যাটার! বোলাররা বরাবরই বোধ হয় ক্রিকেট-রূপকথায় খানিক উপেক্ষিত। কপিল দেব অবশ্যই ব্যতিক্রম ছিলেন। রবি শাস্ত্রীও ছিলেন। রবি মূলত ব্যাটিং অলরাউন্ডার ছিলেন। বিষেণ সিংহ বেদি বাদে প্রায় সিংহভাগ অধিনায়কই ব্যাটার। সেখানে বুমরার অধিনায়কত্ব নিঃসন্দেহে এক অন্য অনুভূতি জাগায়। হলই বা তা আয়ারল্যান্ড সফর। জাতীয় দলের জার্সি পরে শুধু মাঠে নামবেন না, এ বারে নেতৃত্বও দেবেন বুমরা। সম্প্রতি হরভজন সিংহ বলেছেন, বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে বুমরার অভাব অনুভব করেছেন দর্শকরা। এমনকি তিনি বুমরাকে বোলিংয়ের 'বিরাট কোহলি' উপাধিও দিয়েছেন। পিঠের চোট সারাতে বছরের শুরুতেই অস্ত্রোপচার হয়েছিল বুমরার। তার পরে কিছু মাসের রিহ্যাব শেষ করে মাঠে ফিরছেন তিনি। এমনিতে আয়ারল্যান্ড খাতায়-কলমে অত্যন্ত দুর্বল প্রতিপক্ষ। টেস্ট-খেলিয়ে দেশ হলেও এক দিনের ক্রিকেটের বিশ্বকাপে তারা মূল পর্বে কোয়ালিফাই অবধি করতে পারেনি। টি টোয়েন্টি-তেও যে আহামরি কোনও চমক দিয়েছে তারা, তেমনটাও নয়। কিন্তু প্রতিপক্ষ যেমনই হোক না কেন, বুমরা নিজে কতটা ছন্দে আছেন, চোট সারিয়ে বড় মঞ্চের জন্য তিনি কতটা প্রস্তুত... এ সবের একটা ড্রেস রিহার্সাল হয়ে যাবে ডাবলিনে। আর একই সঙ্গে পরখ করে নেওয়া যাবে অধিনায়ক বুমরাকেও। গত বছর কোভিডের কারণে রোহিত শর্মা বার্মিংহাম টেস্ট খেলতে না পারায়, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বুমরা। তাই অধিনায়কত্বে হাতেখড়ি হয়ে গিয়েছিল আগেই, তবে অস্থায়ী হিসেবে। এ বারে একটা গোটা সিরিজে নেতৃত্ব, নিজের ফিটনেস মেপে নেওয়া ও সর্বোপরি বড় অপারেশনের পরে মাঠে ফেরা... সব মিলিয়ে বুমরার চ্যালেঞ্জটা বোধ হয় নিজের সঙ্গেই। এর পরেই রয়েছে এশিয়া কাপ, তার পর বিশ্বকাপ। ম্যাচে ১০ ওভার বল করার আগে তিনি ৪ ওভারে কতটা ফিট, তা এক বার দেখে নিতে চান নির্বাচকরা। দুধে-ভাতে আয়ারল্যান্ড নয়, বুমরার প্রত্যাবর্তনের আসল গুরুত্ব কিন্তু ওই বড় মঞ্চের প্রস্তুতিপর্ব।

বুমরা বোলিংয়ের 'বিরাট কোহলি

এই জয় কার্লোসকে রাতারাতি হিরো বানিয়ে দিয়েছে

নতুন টেনিস তারকা

কুড়ি বছর বয়সে উইম্বলডন জিতে ইতিহাস গড়লেন কার্লোস আলকারাজ়। তাঁকে নিয়ে লিখেছেন **সায়ক বসু**

ছত্রিশ বছর বয়সি নোভাক জোকোভিচ এ বার উইম্বলডনে অংশ নেওয়ার আগেই জিতেছিলেন তেইশটি মেজর ট্রফি! রেকর্ড বলা যায়। কুড়ি বছর বয়সি আলকারাজ় সেখানে গত বছর যুক্তরাষ্ট্র ওপেন জিতেছেন প্রথম বার। ফলে খুব স্বাভাবিক ভাবেই মনে করা হয়েছিল, এ বারের উইম্বলডন ফাইনাল বেশ একপেশে হবে। জোকোভিচ আবার অবিসংবাদী সম্রাট হিসেবে বিবেচিত হবেন। কিন্তু কে জানত, বিশ্বব্যাপী মানুষের জন্য চমক অপেক্ষা করে আছে! আসলে রজার ফেডেরার, রাফায়েল নাদালের পর টেনিস সাম্রাজ্যে তো এমন কেউ ছিলেন না, যাঁকে নিয়ে মেতে উঠতে পারে সকলে। জোকোভিচও কেরিয়ারের শেষ প্রান্তে। ফলে প্রতিটি ক্রীড়াক্ষেত্রেই বোধ হয় এমন এমন তারকার হঠাৎ উত্থান হয়, যাঁরা অক্লেশে চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দিতে পারেন। যাঁকে নিয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম মেতে থাকতে পারে। স্পেনীয় তারকা আলকারাজ় এই ভাবেই দ্যুতি ছড়ালেন। ৪ ঘণ্টা বিয়াল্লিশ মিনিটের ম্যারাথন লড়াই শেষে ১-৬, ৭-৬, (৮/৬), ৬-১, ৩-৬, ৬-৪ সেটে যে রুদ্ধশ্বাস ফাইনাল তিনি জিতলেন, তা অন্যতম সেরা টেনিস লড়াই বলে মেনে নিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। প্রায় পাঁচ ঘণ্টার এই লড়াইয়ে দু'বার সেটে পিছিয়ে গিয়েছিলেন আলকারাজ়! কিন্তু যে ভাবে শারীরিক সক্ষমতা এবং ঠান্ডা মাথার নিদর্শন রাখলেন তিনি খেলায়, তাতে তাঁর প্রতি সকলের কৌতূহল বাড়ছে। কুড়ি বছরের এই তরুণ বড় এবং দীর্ঘ ফাইনালের চাপ এ ভাবে নিলেন কী করে! এমনকি ম্যাচ হেরে জোকার অবধি স্বীকার করে নিয়েছেন আলকারাজ়ের দুর্দমনীয়তার কথা। তাঁর মত, আলকারাজ়ের খেলায় তিন মহা তারকার গুণ রয়েছে। রাফার জেদ, রজারের সংকল্প ও তাঁর ব্যাকহ্যান্ডের জোর। সত্যি বলতে কী, আলকারাজ় এত জোরে ব্যাকহ্যান্ডগুলো মেরেছেন যে, ঠিক সময়ে রিঅ্যাকশনই দিতে পারেননি জোকোভিচ। অথচ ঘাসের কোর্টে শরীরের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে সমস্যা হচ্ছিল দুই খেলোয়াড়েরই। দৌড়োতে সমস্যা হচ্ছিল। পিছলে যাচ্ছিলেন, হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন। বাতাসের জন্যও সমস্যা হচ্ছিল। কিন্তু তাও এই জয় কার্লোসকে রাতারাতি হিরো বানিয়ে দিয়েছে। এবং আশা করা যায়, ভবিষ্যতে কার্লোসের জয়যাত্রা এই ভাবেই এগিয়ে যাবে। অবশ্য এই লেখা প্রেসে যাওয়া পর্যন্ত কার্লোস এখন ছুটি কাটাচ্ছেন। একটি বিলাসবহুল গাড়ি কিনে ফেলেছেন। কিন্তু তিনি জানেন, তাঁর উপর কতটা প্রত্যাশা আছে মানুষের। বরিস বেকার এবং বিয়ন বর্গের পর তৃতীয় কনিষ্ঠতম খেলোয়াড় হিসেবে জিতলেন তিনি। আলকারাজ় স্বীকার করে নিয়েছেন, এই খেতাবটা জিততেই চেয়েছিলেন। নতুন উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন বলেছেন, "চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরেও বলব, এই ট্রফিটা সত্যিই জিততে চেয়েছিলাম। তবে এত তাড়াতাড়ি জিতব ভাবিনি। এটাই আমার জীবনের সবচেয়ে খুশির মুহূর্ত। এখন একটাই লক্ষ্য, এই যে জয়যাত্রা আমার শুরু হয়েছে, এটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।"

দুর্দমনীয় আলকারাজ়

ছোট ছোট খেলা
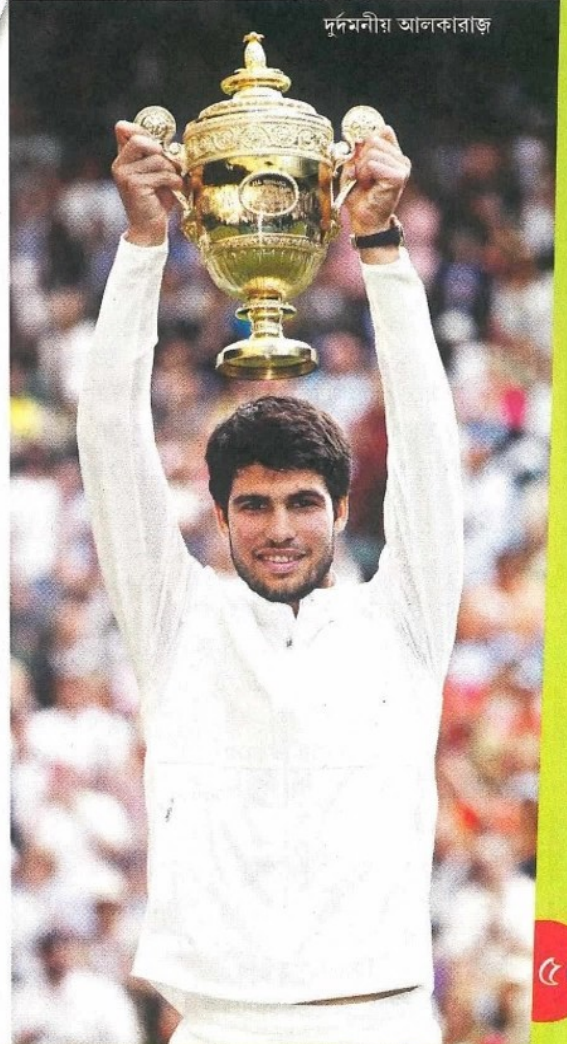
আমাদের রাজ্য থেকে শুরু করে বিশ্বের নানা প্রান্তে ঘটছে খেলাধুলোর নানা ঘটনা। তার ঝলক থাকল এখানে।

খেলায় ফিরছেন সেমেনেয়া

কাস্টার সেমেনেয়া

তাঁর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স সংস্থা। তারই জেরে দীর্ঘ প্রায় পাঁচ বছর আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিক্স দুনিয়ার বাইরে ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার এই নামী অ্যাথলিট। অলিম্পিক্স এবং বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জয়ের মালিক, বত্রিশ বছরের কাস্টার সেমেনেয়া দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ে জিতে আবার ট্র্যাকে ফিরছেন। ২০১৮ সালে লিঙ্গবৈষম্যের কারণ দেখিয়ে বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স সংস্থা তাঁর বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করে বসে। এর আগেও এক বার তাঁকে নিষেধাজ্ঞার কবলে পড়তে হয়েছিল। সেমেনেয়ার শরীরে টেস্টোস্টেরন হরমোনের মাত্রা অনেক বেশি। শারীরিক সক্ষমতা পুরুষদের মতো। যদিও তিনি ওষুধ নিয়ে শরীরে ওই হরমোন বাড়িয়ে নিয়েছেন, এমন কোনও প্রমাণ মেলেনি। এই অবস্থায় সেমেনেয়া সুইৎজ়ারল্যান্ডের কোর্ট অফ আরবিট্রেশন ফর স্পোর্টসে সুবিচার চেয়ে আবেদন করেন। সেখানেও সমস্যার সমাধান না-হওয়ায়, প্যারিসে ইউরোপীয় মানবাধিকার কোর্টে আবেদন করেন। সেই আবেদনে ফল মিলেছে। নিষেধাজ্ঞা বাতিল হওয়ায় আগামী ২০২৪ প্যারিস অলিম্পিক্সে দৌড়োতে পারবেন সেমেনেয়া। আবার সোনা জয়ের স্বপ্ন দেখছেন তিনি।

ক্রিকেটকে বিদায় জানালেন ব্রড

ফর্মে থাকা অবস্থায় ক্রিকেটকে গুডবাই জানিয়ে সরে গেলেন তিনি। এত নাটকীয় ভাবে তাঁর টেস্ট জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে, তিনি নিজেও ভাবেননি। ড্র হয়ে যাওয়া এ বারের অ্যাশেজ সিরিজ়ে ওভালে শেষ টেস্ট ম্যাচে ইংল্যান্ডকে জয় এনে দিয়ে ক্রিকেটকে বিদায় জানালেন সাঁইত্রিশ বছরের ইংলিশ জোরে বোলার স্টুয়ার্ট ক্রিস্টোফার জন ব্রড। ১৬৭ টেস্টে পেলেন ৬০৪টি উইকেট। ২০০৭ সালে কলম্বোয় শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ব্রডের টেস্ট অভিষেক হয়। শ্রীলঙ্কান জোরে বোলার চামিন্ডা ভাস তাঁর টেস্ট ক্রিকেটের প্রথম শিকার। টেস্টে দু'টি হ্যাটট্রিক আছে তাঁর। অ্যাশেজে ইংল্যান্ডের হয়ে সর্বাধিক উইকেট-শিকারি ইয়ান বথামের ১৪৮টি উইকেটের নজিরকেও পিছনে ফেলে দিয়েছেন ব্রড। এই অ্যাশেজে নিজের ১৬৬তম টেস্টে ৬০০ উইকেট তুলে নিয়েছিলেন ব্রড। ম্যাঞ্চেস্টারের ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে সিরিজ়ের চতুর্থ টেস্টের প্রথম দিনে অজ়ি ব্যাটার ট্র্যাভিস হেডকে আউট করেই ছশো ক্লাবে পঞ্চম সদস্য হিসেবে নাম লিখিয়ে ফেলেন তিনি। জেমস অ্যান্ডারসনের পর তিনিই ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় বোলার, যিনি ছশো উইকেট-শিকারিদের ক্লাবে জায়গা পেয়েছেন।

স্টুয়ার্ট ক্রিস্টোফার জন ব্রড

সোনার মেয়ে জ্যোতি

জ্যোতি ইয়ারাজি

তাইল্যান্ডের ব্যাঙ্ককে সদ্য শেষ হওয়া এশিয়ান অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে ১০০ মিটার হার্ডলসে সোনা জিতে নজির গড়লেন ভারতের জ্যোতি ইয়ারাজি। দেশের প্রথম কোনও মহিলা প্রতিযোগী হিসেবে সোনা জিতলেন অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমের এই অ্যাথলিট কন্যা। ১৩.০৯ সেকেন্ড সময় করে সোনা জিতে জ্যোতি পিছনে ফেলে দিয়েছেন জাপানের দুই প্রতিযোগী তারেদা আসুকা (১৩.১৩) এবং ওউকি মাসুমিকে (১৩.২৬)। জাতীয় পর্যায়ে অবশ্য জ্যোতির ১২.৮২ সেকেন্ডের রেকর্ড আছে। ২০২২ সালের ১৭ অক্টোবর প্রথম ভারতীয় মহিলা হার্ডলার হিসেবে তিনি তেরো সেকেন্ডের কম সময়ে ১০০ মিটার দৌড় শেষ করে নজির গড়েছিলেন।

ফেরার আশায় পেরেরা

সচিনি পেরেরা

পোল ভল্টে দেশের হয়ে জাতীয় রেকর্ড করেছেন। ২০১৪ সালে গ্লাসগো কমনওয়েল্থ গেমসে জাতীয় দলের হয়ে তাঁকে প্রতিনিধিত্ব করতেও দেখা গিয়েছে। শ্রীলঙ্কার সেই 'ভল্টিং কুইন' সচিনি পেরেরা এখন দুবাইয়ে এক পরিবারে পরিচারিকার কাজ করছেন। চব্বিশ বছরের এই শ্রীলঙ্কান অ্যাথলিটকে কেন খেলাধুলো ছেড়ে এমন কাজে যুক্ত হতে হল? আসলে হঠাৎ পেরেরার মা স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। শয্যাশায়ী মায়ের চিকিৎসার খরচ জোগাড় করতেই গত বছর জুলাই মাসে তাঁর দেশ ছেড়ে দুবাইয়ে চলে যাওয়া। মেয়ের পাঠানো অর্থেই চিকিৎসা চলে মায়ের। এখন তিনি অনেকটাই সুস্থ। শ্রীলঙ্কা জুড়ে আর্থিক সঙ্কটের কারণে অনেকের মতোই উপার্জনের আশায় দেশ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন পেরেরাও। গত বছরই ৩.৭১ মিটার লাফিয়ে পোল ভল্টে নতুন জাতীয় রেকর্ড গড়েছিলেন তিনি। আগে জিমন্যাস্টিক্স করতেন। ২০১৭ সাল থেকে তিনি পোল ভল্টার। পরিস্থিতি বদলালে আবার ট্র্যাকে ফিরতে চান তিনি। পেরেরার চোখে নতুন করে আবার পদক জয়ের স্বপ্ন।

কিংবদন্তি ফুটবলার মার্তা

অস্ট্রেলিয়া-নিউ জ়িল্যান্ডের যৌথ আয়োজনে চলছে মহিলাদের বিশ্বকাপ ফুটবল। এই বিশ্বকাপে মার্কিন তারকা মহিলা ফুটবলার মেগান র‍্যাপিনোর মতোই জীবনের শেষ বিশ্বকাপ খেলতে নেমেছেন ব্রাজ়িলের তারকা ফুটবলার মার্তা ভিয়েরা দ্য সিলভা। মেগান আমেরিকাকে বিশ্বকাপ এনে দিলেও মার্তা পারেননি। এ লেখা প্রেসে যাওয়া অবধি বিশ্বকাপে পেলের দেশের মেয়েরা সুবিধেজনক অবস্থায় নেই। সাঁইত্রিশ বছরের কিংবদন্তি ফুটবলার মার্তা এ নিয়ে টানা ষষ্ঠ বার ব্রাজ়িলের হয়ে বিশ্বকাপ খেলছেন। ২০০৭ সালে রানার্স হলেও বিশ্বকাপ তাঁর কাছে আজও অধরাই। অথচ গত বিশ্বকাপ পর্যন্ত ১৭টি গোল করে মেয়েদের বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ গোলদাতা তিনিই। এমনকি পুরুষদের ফিফা বিশ্বকাপে জার্মানির মিরোস্লাভ ক্লোজ়ের গড়া সর্বাধিক ১৬ গোলের নজিরকেও টপকে যান তিনি। ২০০২ সাল থেকে ব্রাজ়িলের মহিলা দলের হয়ে খেলছেন। ছ'বার পেয়েছেন ফিফার বর্ষসেরা ফুটবলারের সম্মান। এর মধ্যে ২০০৬ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত টানা তাঁর হাতেই উঠেছে ফিফার বর্ষসেরার খেতাব। শেষ বিশ্বকাপ থেকেও কিংবদন্তি মার্তা খালি হাতে ফিরবেন কি না, সেটা সময়ই বলবে।

মুরলী শ্রীশঙ্কর

মার্তা ভিয়েরা দ্য সিলভা

প্যারিস যাচ্ছেন মুরলী

আগামী বছর প্যারিস অলিম্পিক্স। এ দিকে টোকিয়ো অলিম্পিক্সের মতো প্যারিস অলিম্পিক্সেরও ছাড়পত্র পেয়ে গেলেন ভারতীয় লং-জাম্পার, কেরলের মুরলী শ্রীশঙ্কর। ব্যাঙ্ককে এশীয় অ্যাথলেটিক্সে মুরলী ৮.৩৭ মিটার লাফিয়ে রুপো জিতেছেন। এই সঙ্গেই পেয়েছেন প্যারিসে যাওয়ার যোগ্যতা। গত জুন মাসে ভুবনেশ্বরের জাতীয় অ্যাথলেটিক্সে ৮.৪১ মিটার লাফিয়ে এশিয়ান গেমসের সঙ্গে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে নামারও ছাড়পত্র পান। মাত্র এক সেকেন্ডের জন্য জেসউইন অলড্রিনের গড়া ৮.৪২ মিটারের জাতীয় রেকর্ড ছুঁতে পারেনি। অগস্টে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ, সেপ্টেম্বরে এশিয়ান গেমস। সাফল্যের সন্ধানে মুরলী।

মরসুমের প্রথম ডার্বি ডুরান্ডে

ডুরান্ড কাপ ফুটবল

ফটো: লেখক

শুরু হয়ে গিয়েছে ডুরান্ড কাপ ফুটবল। চব্বিশ দলের এই প্রতিযোগিতায় একই গ্রুপে রয়েছে ইস্টবেঙ্গল আর মোহনবাগান। ১২ অগস্ট ডুরান্ড কাপে মরসুমের প্রথম ডার্বিতে মুখোমুখি হবে কলকাতার দুই প্রধান। ছ'টি গ্রুপের মধ্যে 'এ' গ্রুপে রয়েছে কলকাতার দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী। এ, বি এবং সি গ্রুপের খেলাগুলো হবে কলকাতায়। ডি, ই গ্রুপের ম্যাচগুলো হবে গুয়াহাটিতে। 'এফ' গ্রুপের লড়াই হবে কোকড়াঝোড়ে। ১৩২তম ডুরান্ডে আইএসএলের বারোটি এবং আইলিগের ৫টি দল অংশ নিচ্ছে। বিদেশি বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটানের সেনা দলের সঙ্গে অংশ নিচ্ছে ভারতের আর্মি, নেভি ও এয়ারফোর্সের তিন সেনা দল। ৩ সেপ্টেম্বর ফাইনাল। ভারতীয় সেনাবাহিনী পরিচালিত বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন এই ফুটবল টুর্নামেন্টের সূচনা হয়েছিল ১৮৮৮ সালে। ব্রিটিশ আধিকারিক স্যর মার্টিমার ডুরান্ড-এর নামানুসারে প্রতিযোগিতার নামকরণ হয়। সিমলা শহরে বসেছিল প্রথম ডুরান্ড ফুটবলের আসর। এ বার প্রতিযোগিতা শুরুর আগে দেশের নানা শহরে ডুরান্ড কাপ পরিভ্রমণ করে। কলকাতায় ডুরান্ড কাপের উন্মোচন উপলক্ষে ভারতীয় সেনাবাহিনীর দুই অবসরপ্রাপ্ত সেনা অফিসার কলকাতা ময়দানের কাছেই চৌরঙ্গির 'দ্য ফর্টিটু' নামের পঁয়ষট্টি তলা বহুতলের ছাদ থেকে বেস জাম্পের মাধ্যমে অনুষ্ঠান স্থলে নেমে এসে সবাইকে চমকে দেন। প্রাক্তন গ্রুপ-ক্যাপ্টেন কমল সিংহ ওবেরা ও লেফটেন্যান্ট কর্নেল সতেন্দ্র বর্মা প্যারাশুটে ঝাঁপ দিয়ে উপস্থিত দর্শকদের এক রোমাঞ্চকর অনুভূতি উপহার দেন।

চন্দন রুদ্র

১

৩

২

৪

র	স	গো	ল্লা
সা	ত	ষ	ট্রি
ত	রো	য়া	ল
ল	ক্ষা	ধি	ক
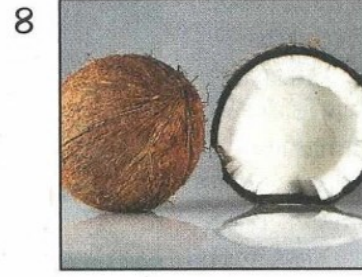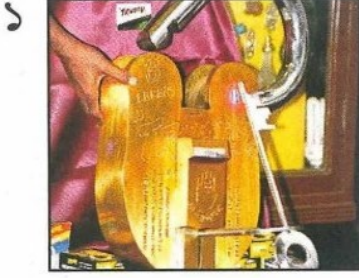
ছবিতে শব্দ খোঁজো

চারটি ছবি দেওয়া আছে। ছবি দেখে সেগুলোর বাংলা নাম পর পর খোপে লিখে ফ্যালো। এ বার সেই শব্দগুলোর প্রথম অক্ষর দিয়ে তৈরি হবে একটি বিশেষ শব্দ। শব্দটি তোমাদের পরিচিতই। পেলে খুঁজে?

এ বারের সঙ্কেত : তালজ্ঞানহীন। যার ভাল-মন্দ কাণ্ডজ্ঞান নেই।

৫ জুলাই সংখ্যার সমাধান

র সা ত ল

÷ x + –
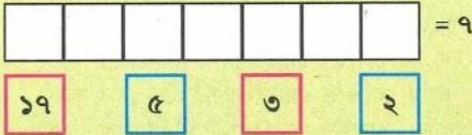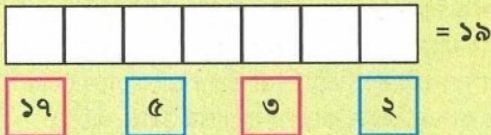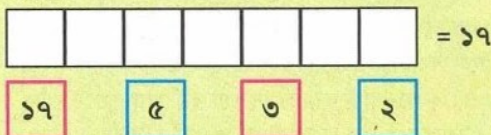
Go Figure

খোপের নীচে দেওয়া চারটি সংখ্যা যেমন খুশি প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম এবং সপ্তম খোপে বসাও। যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগের মধ্যে যে-কোনও চিহ্ন বসাও দ্বিতীয়, চতুর্থ এবং ষষ্ঠ খোপে। যাতে অঙ্কটি কষলে ডান দিকে দেওয়া সংখ্যাটি তার ফল হয়। চারটি সংখ্যা একবারই ব্যবহার করবে। মনে-মনে বন্ধনীও ব্যবহার করতে পার। এই ধাঁধার একাধিক উত্তর হতে পারে।

সহজ

							= ৭

১৭ ৫ ৩ ২

মাঝামাঝি

							= ১৯

১৭ ৫ ৩ ২

কঠিন

							= ১৭

১৭ ৫ ৩ ২

৫ জুলাই সংখ্যার সমাধান :

সহজ : (৬ + ৩) – (১৩ – ১০) = ৬

মাঝারি : (৭ × ২) ÷ (৮ – ১) = ২

কঠিন : (৩ × ৭) + (২১ ÷ ৩) = ২৮

উপর-নীচ দুটো বিভাগের সঠিক উত্তর ২০ অগস্ট-এর মধ্যে anandamelamagazine@gmail.com ঠিকানায় পাঠালে তবেই সঠিক উত্তরদাতা হিসেবে তোমাদের নাম উঠবে।

পরমব্রত পাল, *সপ্তম শ্রেণি, ওরিয়েন্টাল পাবলিক স্কুল, কল্যাণী, নদিয়া।* **দেবদিশা সরকার**, *ষষ্ঠ শ্রেণি, অগ্রদ্বীপ ইউনিয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কাটোয়া।* **রাজর্ষি সাহা**, *ষষ্ঠ শ্রেণি, রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম রহড়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়।* **সপ্তক ঘোষ**, *ষষ্ঠ শ্রেণি, বোলপুর হাই স্কুল, বীরভূম।* **বৈশালী পোদ্দার**, *অষ্টম শ্রেণি, অগজ়িলিয়াম কনভেন্ট স্কুল, ব্যান্ডেল।* **বিতান পোদ্দার**, *সপ্তম শ্রেণি, ডন বস্কো স্কুল, ব্যান্ডেল।* **অদ্রীশ মাইতি**, *চতুর্থ শ্রেণি, সরস্বতী শিশুমন্দির, মেদিনীপুর।* **শ্রেয়স মিত্র**, *অষ্টম শ্রেণি, ছান্দ্রা উচ্চ বিদ্যালয়, হুগলি।* **অনন্ত্রম দাস**, *ষষ্ঠ শ্রেণি, রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, রহড়া।* **স্পন্দন ভাদুড়ী**, *পঞ্চম শ্রেণি, বিড়লা হাই স্কুল, কলকাতা।* **দেবমাল্য খাঁ**, *অষ্টম শ্রেণি, বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম উচ্চ বিদ্যালয় (উঃ মাঃ)।*